

# বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



বাংলা বুক পিডিএফ



# বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেটিসের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিজ্ঞপ

৮৬/১, মহাবলাপাড়া রোড □ কলকাতা-৯

প্রকাশক : রবীন বন  
৮৬/১ মহাত্মাবাহী রোড  
কলকাতা-৯

প্রকাশনা পরামর্শ : অধীর চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭  
প্রচ্ছদ : গৌতম হার

ভাষা : কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর :  
বঙ্গী শিখাস্  
৫৩, রাজা বিনোয় ট্রাট  
কলিকাতা-৭০০ ৩০৯

**বি**শ্বমামা নামকরা বিজ্ঞানী হলে কী হবে, বাড়ির মধ্যে একেবারে ছেলে মানুষ। কঁচা আম পাতলা করে কেটে মুন নিতে খেতে খুব ভালো বাসেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কম্পিটিশন শুরু করে দেন। আবার গভীর মনোযোগ নিয়ে বিজ্ঞানের কঠিন প্রবন্ধ লিখতে লিখতে হঠাৎ বিনু ও নীলুকে ডেকে নিয়ে লুঙা খেলতে বসে যান। আবার কখনো কখনো গবেষণার কাজে এমন ভাবে যান যে লাওয়া-বাওয়াও যান হুগে।

সেখতেও অন্যসব বিজ্ঞানীদের মতন নয়। লাড়ি পৌফ নেই, মাথায় টাকও নেই। খায়ের রঙ বগলবে করসা। লম্বা ছিপছিপে চেহারায় নাকটাই বা একটু বেশি লম্বা। কথাবার্তা একটু অদ্ভুত শোনালেও সব কিছু মতোই রয়েছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

হাজারিবাগের অঙ্গলে পেট্রল ফুরিয়ে গেলে সঙ্গে যত্ন নিয়ে যাওয়া পাথর গলিরেই পেট্রল সংগ্রহ করে নিলেন বিশ্বমামা। আর সেই পাথরগুলোই যে ‘অরেল স্যান্ড’ ভা কি আমরা জানিতাম।

বিশ্বমামার অবির্ভাব শূরদীপ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (১৯৯০)-এর পাতায়। পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই হরহাতা চরিত্রটি সৃষ্টি করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এতদিন যত্নে বিশ্বমামার নানা কীর্তিকলাপ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতাতেই অটকে ছিল। সেই সব কাহিনী নিয়েই এই প্রথম ‘বিশ্বমামার পোরেন্ডারি’ প্রকাশিত হল। ফনসা-টেনিবা-ফেলুবার মতোই সকলের আপনজন বিশ্বমামার গল্প শুনেছে ছোটরা যে হৈ হৈ করে ছুটে আসবে এতে আর অশ্চর্য কি।

কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭

প্রকাশক



# বিশ্বমার

কবিতা	৫
হাস্য হাস	১৪
আবিষ্কার	২২
কারনামা	৩২
মহাজিৎ	৪০
গোয়েন্দাবিরি	৪৮

## বিশ্বমামার রহস্য

আমার বিশ্বমামা প্রায় সারা বিশ্বেরই মামা।

আমার মা-মাসিরা সাত বোন। তাদের ঐ একটিই ভাই। আমরা মাসতুতো ভাই-বোনেরা মিলে উনিশ জন, আমাদের সকলের ঐ একমাত্র মামা। আমাদের দেখানেনি পাড়ার ছেলেমেয়েরা শুকে মামা বলে ডাকে।

বিশ্বমামা প্রায়ই দেশ-বিশেষে বস্তুত্বা নিতে যায়। বিদেশীরা ওর নামটা ঠিক মত উচ্চারণই করতে পারে না। তারা বিস্ণুয়া বিস্ণুয়া বলে। তাই বিশ্বমামা অনেককে বলেন, কল্মী মামা, এটা আমার ভাক নাম। মামা বলটা বেশ সোজা। তাই বিশ্বমামা অনেক সাহেব-মেমদেরও মামা বলে গেছে।

বিশ্বমামা বেশ আমুলে মজার মানুষ।

যদিও খুব নামকরা বিজ্ঞানী। দেশ-বিশেষে খুব খাতির। কিন্তু বাড়ির মধ্যে একেবারে ছেলেমানুষের মতন। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন নিয়ে বেতে খুব ভালোবাসেন। সিঁড়ি দিয়ে এক সঙ্গে নামবার সময় হঠাৎ বলেন, কম্পিউশন বিবি, কে আগে নামতে পারে? বলেই দুন্দাড় করে দৌড়তে শুরু করেন। দারুন শক্ত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতে উঠে এসে বলেন, এই লুডো খেলবি?

বাঁহিরের লোকরা অবশ্য কেউ এই সব কথা জানে না।

সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের লাড়ি থাকে, পৌফ থাকে, মোটা কাচের চশমা আর মাথায় থাকে টাক। বিশ্বমামার কিন্তু লাড়ি গৌফ কিছু নেই। আজও তার চশমা লাগে না, মাথায় চুলও ছড়খট। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। নাকটা একটু বেশী লম্বা। গায়ের রং বেশ ফর্দা বলে ছোটবেলায় খুঁকে অনেকে বলতো, নাকেশ্বর ধপধপে। এখন অবশ্য এই নামটা আর বিশেষ কেউ বলে না।

তবে আমরা জানলুম কী করে?

বিশ্বমামা মাঝে মাঝে পাওয়া মাওয়া ভুলে গবেষণার কাজে ভুবে থাকলে আমার মা বলত, এই নাকেশ্বর ধপধপে, তোর কি খিদে - তেঁষ্টা কিছু নেই?

একটা কিছু আবিষ্কার কর দেখি। যাতে মানুষের খিদের সমস্যা ঘুচে যায়।

বিশ্বমামার অনেক গুণ কিন্তু একটা খুব বড় নোথ থাকে। কিছুতেই কোনো কথার সোজাসুজি উত্তর দেন না। এক সময় তাতে আমাদের খুব রাগ ধরে।

এই যেমন বিশ্বমামা এক বছরের জন্য ক্যানাডায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন কয়েকদিন আগে। আমি জিজ্ঞেস করলাম। বিশ্বমামা তুমি ওখানে নায়েগ্গা ফলস দেখেছো?

বিশ্বমামা চোখ বড় বড় করে বললো, ওরে বাবা, এবারে কী হয়েছিল জানিস? ওরা আমায় ধরে রাখতে চাইছিল, প্রায় জোর করে।

আমি বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম, ওরা মানে কারা? নায়েগ্গার কাছে কারা তোমায় ধরে রাখতে চেয়েছিল?

বিশ্বমামা বললেন, আখাবান্জা!—আখাবান্জা। বলে কি, তুমি এইখানে থাকো, মামা, তোমাকে অনেক টাকা-পয়সা দেবো। বিরাট বাড়ি দেবো, নতুন গাড়ি দেবো, যা তুমি চাও। এখানে থেকে তুমি ঐ কাজটা করো। আমি বললুম, উহু, সেটা হচ্ছে না। আমি নিজের সেশে কিরে এই কাজ করবো। আমার সেশের যাতে উপকার হয়—সেটা আমি দেখবো না?

বোঝ গালা। কোথায় নায়েগ্গা জলপ্রপাত আর কোথায় আখাবান্জা। খুঁই হোক, নায়েগ্গার কথাটা মূলতুবি রেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাজ মানে কী কাজ? কিসে আমাদের সেশের উপকার হবে?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললো, হাজারিবাগে ছোট্টিনীদের খবর কী রে? ভাবছি, সেখানে একবার বেড়াতে যাবো।

এসব বোঝে কার মাথা।

এসব কথা শুনে মনে হয় খুবই এলোমেলো, কিংবা বিশ্বমামার মাথার গোলমাল আছে, আসলে কিন্তু তা নয়। এই সব কথার মানে বোঝা যায় কয়েকদিন পর।

ক্যানাডা থেকে বিশ্বমামা এবার এক বাগ্ন-ভর্তি পাথর নিয়ে এসেছেন। সেগুলো কিছু নামি পাথর বলে মনে হয় না। এমনি সাধারণ বেলেপাথরের মতন। ছোট, বড়, নানান রকমের টুকরো।



অত দূর থেকে বয়ে এনেছেন পাথরগুলো। কিন্তু নিজের ঘরে বেখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখেছেন। একটা দুটো কেউ নিয়ে গেলেও যেন ক্ষতি নেই। কিন্তু কেই বা নেবে? কর্নাভার পাথর বলে আলাদা করে তো কিছু বোকা যায় না। ওরকম পাথর আমাদের এখানেও কত পাওয়া যায়।

একদিন দুপুরে বিশ্বমামার ঘরে গিয়ে সেখি যে সব কাটা জানলা বন্ধ। অফিসার ঘরে আলো ছেলে বিশ্বমামা কী সব লিখছেন। একটু উঁকি মেয়ে দেখলুম, দারুন কঠিন সব অক্ষ।

কিন্তু দিনের বেলায় এরকম জানলা বন্ধ রাখার কী মানে হয়? বাইরে বেশি লোকও নেই, বেশ মেঘলা-মেঘলা সুন্দর দিন।

আমি একটা জানলা খুলতে যেতেই বিশ্বমামা ঠেঁচিয়ে উঠে বলল, খুলিস না। খুলিস না। জানলা খুললে বিপদ হতে পারে। দেখছিস না। আমি তিন চারদিন বাড়ি থেকে বেরুজি না একদম। ওরা বেখহর আমাকে খুল করতে চায়। আমার গিলে চমকে উঠলো বুঝ। কী সাত্যমাতিক ব্যাপার।

কিন্তু বিশ্বমামা এমনভাবে বললেন, যেন খুলটা কিছুই না। কেউ যেন সন্দেহ খেতে চায় কিংবা নোদনায় দুসতে চায়।



আমি বললুম, কারা তোমাকে খুন করতে চায়। তাহলে তো একুনি খবর নিতে হবে।

বিশ্বমামা বললেন, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এখন কাছকাছি কী পূজো আছে বল তো? কুমোরটুলিতে এখন কী মূর্তি গড়া হচ্ছে?

—কুমোরটুলীর মূর্তি।

—তুই এক কাজ করতো, নীলু। তোকে আমি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি। কুমোরটুলী থেকে আজই একটা মূর্তি কিনে নিয়ে তো: ও হাঁ, শিপশিরই তো বিশ্বকর্মা পূজো। বিশ্বকর্মার মূর্তি হলেই চলেবে। শুধু নাকটা একটু বেশি লম্বা করে দিবি। অনেকটা ফেন আমার মতন মুখটা দেখতে হয়।

—তোমার মতন মূর্তি।

—হ্যাঁ, শিপশির চলে যা। বিলুর তো একটা ভ্যান আছে। সেই গাড়ির বিকে গুইরে, ঢাকাটুকি নিয়ে নিয়ে আসবি, কেউ ফেন দেখতে না পায়।

জোর করে আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললো, যা, যা, দেরি করিস না। একুনি চলে যা।

আমাকে যেতেই হলো।

এরপর একটার পর একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল।

বিলু আমার মাসতুতো দাদা। সে ভালো গাড়ি চালায়। তার একটা পুরোন ভ্যান আছে।

বিলুনা জানে, বিশ্বমামা সব সময় রইসা করে কথা বলে। পরে যাতে বোঝা যায়। আমার কথা শুনে বললো চল, একটা মূর্তি কিনে আনি। তারপর দেখা যাক কী হয়।

বিশ্বকর্মা পূজোর দিন সাতেক দেরি আছে বটে কিন্তু কুমোরটুলিতে এর মধ্যে অনেক মূর্তি গড়া হয়ে গেছে। একটু কাঁচা দেখে একটা মূর্তি নিয়ে আমরা কুমোরকে বললুম, নাক-চোখ খানিকটা পাল্টে দিতে।

সেই মূর্তি এনে রাখা হলো বিশ্বমামার ঘরে।

বিশ্বমামা বললেন, বা বেশ হয়েছে। এ যে ঠিক আমার মতন। তোরা এখন যা। আমাকে ভিসিটার্স করিস না। রাক্তিরে বারোটার সময় আমার ঘরে আসিস।

কাউকে কিছু বলবি না।

তারপর থেকে আর আমাদের সময় কাটে না। কখন সন্ধ্য হবে। কখন রাত্তির হবে?

ঠিক বারোটায় বিশ্বমামার ঘরে আসতেই তিনি বললেন, এসেছি। এবার এক কাজ করা যাক। মূর্তিটা টেনে সামনের জানলার কাছে নিয়ে আয় তো।

আমরা সবাই ধরাধরি করে সেটাকে নিয়ে এলাম জানলার কাছে, মুখটা করা হলো রাত্তির সিকে, তারপর খুলে দেখা হলো জানলা। এবার মনে হলো বিশ্বমামাই যেন জানলা দিয়ে রাত্তি দেখছেন।

বিশ্বমামা বললেন, এবার সবাই খাটের নীচে গুয়ে পড়। শুয়ে পড়। একটা মজা দেখতে পাবি।

আমরা গুয়ে রইলাম খাটের নীচে। বিশ্বমামা ট্রোটো আসুল নিয়ে আছে। কথা বলাও বারণ। এক একটা মিনিট কাটছে এক ঘণ্টার মতন।

খানিক বাদেই পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো।

মাটির মূর্তিটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

বিশ্বমামা বললেন, দেখলি, দেখলি ওরা আমার খুন করতে চায় কিনা?



বিলুনা আর আমি এক সঙ্গে বলে উঠলাম, ওরা কারা? কে তোমার খুন করতে চায়?

বিশ্বমামা বললেন, হাজারীবাগ। আমার একুনি হাজারীবাগ যাওয়া দরকার। রাস্তা এখন ক্রিয়ায়। গুলি ছোড়ার পর ওরা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না বিলু, আজ রাত্তিরে তোমার গাড়িতে আমায় হাজারীবাগ পৌঁছে নিতে পারবি।

আধঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিশ্বমামা যখন যা চাইবে, তরতে সেরী করা চলবে না।

বিশ্বমামা নিজের গবেষণার কিছু যত্নপাতি, জরুরি কাগজপত্র আর ক্যান্ডিডার সেই পাখরগুলো গাড়িতে বোঝাই করলেন। হাজারীবাগে কত পাখর আছে, তবু এগুলো নিয়ে বাবার দরকার কী?

কিন্তু জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। উত্তর পাবো না।

গাড়ি চালাতে লাগলেন বিলুনা, তার পাশে আমি। পেছনে বিশ্বমামা।

বিশ্বমামা বারবার পেছনের দিকে তাকাতে লাগলেন। আমাকে বললেন, মীলু লক্ষ্য রাখবি। কেউ আমাদের ফলো করছে কিনা। সে রকম সন্দেহ হলেই রাস্তা পান্টাইতে হবে।

এত রাত্তিরে একেবারে ফাঁকা। গাড়ি বিশেষ নেই। কলকাতা ছাড়িয়ে আমরা নিম্নি রোড ধরলাম। কেউ আমাদের ফলো করছে বলে মনে হলো না।

বিলুনা এত জোরে গাড়ি চালালো যে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে আমরা চলে গেলুম বহু দূরে।

তারপর একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ভোরের কিছুটা বাকি আছে। বিলুনা যদিও আমাকে ঘুমোতে বারণ করেছিল, তবু আমি চুপে চুপে পড়ছি মাঝে মাঝে।

হঠাৎ এক সময় গাড়ির গতি আটকে হতে হতে একেবারেই থেমে গেল। বিলুনা বলে উঠলো, সর্বনাশ!

পেছন থেকে বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

বিলুনা বললেন, ইস। দারুন ভুল করে ফেলেছি। পেট্রলের হিসেব করতে ভুল হয়ে গেছে। ভেবেছিলুম যা পেট্রল আছে তাতে ধানবাদ পর্যন্ত হয়ে যাবে।

গুথান থেকে আবার পেট্রল ভরে নেবো। এখন কী হবে? জঙ্গলের মধ্যে জেগে থাকতে হবে। সকাল না হলে তো কিছু করাও যাবে না।

আমি, ভর পেয়ে গেলুম খুব। জঙ্গলের মধ্যে থেমে থাকবি—যদি তাকাত আসে।

বিশ্বমামা অকণ্য বললো, না প্রবলেম। সেবি কী করা যায়। তোরা নেমে পড়। একটু এগিয়ে দ্যাখ, কোনো গাড়িটাড়ি এসে পড়ে কিনা।

ভয়েই আমরা পাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

বিশ্বমামা বললো, আর একটু দূরে যা। আমি কী করছি লেখবি না। তাকালে



আসবি।

মিনিট মশেক বাদেই বিশ্বমামা ডাকলো, বিলু, নীলু, এনিকে আয়।

আমরা দৌড়ে এসে সেখি বিশ্বমামা কয়েকটি যন্ত্র রাক্তার নামিয়ে কী সব করছিলেন, এখন সেগুলো আবার গাড়িতে তুললেন।

বিলুদাকে বললো দ্যাখ তো, গাড়ি এবার স্টার্ট নেয় কিনা?

বিলু বললো, তেল ছাড়া কী করে স্টার্ট নেবে?

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, দ্যাখ না!

বিলুদা উঠে ঢাখি লাগিয়ে ঘোরাতেই গাড়িটা জেগে উঠলো। বিলুদা দারুন অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বললো—একী? একী? তেল এলো কী করে?

গাড়ি স্টার্ট নিলেই শুধু না, দেখা যাচ্ছে যে তেলের কীটস খানিকটা ওপরে উঠে গেছে। গাড়িতে তেল ভরা হয়েছে। অথচ এক ফোটা তেল ছিল না।

বিলুদা বললো, বিশ্বমামা, গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গেল, এটা কি ম্যাজিক নাকি? তুমি তেল পেলে কোথায় বলতেই হবে।

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, পাথর।

আজ্ঞা কোনো মানে হয়? এর কোনো মাথা মুড়ু আছে? পেট্রল কোথায় পাওয়া গেল, তার উত্তর কি পাথর হতে পারে?

বিশ্বমামা চোখ বুজে ফেললেন। আর কিছু বললেন না।

তিনদিন পরে বোঝা গেল, পাথরটাই উত্তর। ক্যানাডায় কেন তলা বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বমামাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কেন বিশ্বমামা দেশের উপকার করার জন্য কিংবে এলেন, কেন কিছু লোক তাঁকে খুন করতে চেয়েছিল, এমনকি গাড়িতে কী করে পেট্রোল এলো, এই সব কীটা প্রশ্নের উত্তরই পাথর।

বিলুদা বিশ্বমামার ঘরের কিছু কাগজপত্র পড়ে নিজে বুকেছে, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ক্যানাডার অ্যাথাবাস্কা নদীর ধারে প্রচুর পাথর পড়ে থাকে সেগুলিকে সাধারণ বেলেপাথরের মতো দেখতে হলেও একটা দারুন বৈশিষ্ট্য আছে। শুগুলো আসলে হচ্ছে অয়েল স্যান্ড বা তৈল শিলা। পেট্রোলিয়ামই কোনো ভাবে এই সব পাথরের মধ্যে ঢুকে থাকে। এখন এই পাথর থেকে আবার পেট্রোলিয়াম

বের করতে পারলে পৃথিবীর তেলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের দেশে পেট্রোলের খুব অভাব, আমাদের খুব উপকার হবে।

কী করে এই সব পাথর থেকে সস্তায় পেট্রোল বার করা যায় তা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। সেই গবেষণায় বিশ্বমামা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আবার আরকের যে সব দেশে খুব সহজেই পেট্রোল পাওয়া যায়, তারা ভাবছে, পাথর থেকে পেট্রোল বার করতে পারলে তাদের পেট্রোলের দাম কমে যাবে। তাই তারা চাইছে এই গবেষণা বন্ধ করতে। তাদের কেউ খুন করতে চেষ্টা করেছিল বিশ্বমামাকে।

বিশ্বমামা পাথর থেকে তেল বার করার উপায়টা বার করে ফেলেছেন কিন্তু সেটাকে আরও সহজ করা দরকার। তাই নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন হাজারীবাগে বসে। খুব গোপনে। তাঁকে এখন একটুও ডিসটার্ব করা যাবে না।



## বিশ্বমামার হায় হায়

এ বার অনেক দিন পর সেশে ফিরছেন বিশ্বমামা। পাঁচ মাস তো হবেই! সাধারণত এত বেশিদিন তিনি বাইরে থাকেন না। পৃথিবীর নানা সেশে বহুতা করতে যান, ফিরে আসেন এক-দেড় মাসের মধ্যে। অন্য সেশে বিশ্বমামা বেশিদিন থাকতে চান না, তার কারণ বাঙালী রান্না ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাঁর পছন্দ হয় না। কুমড়া আর কুচো টিংড়ি নিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি তো আর কোনো সেশে পাওয়া যাবে না। পটঙ্গের সোরমাই বা অন্য সেশে কে তাঁকে তৈরি করে দেবে? বিশ্বমামা মাংস খান না একেবারেই।

দমনম এয়ারপোর্টে আমরা করেকজন বিশ্বমামাকে আনতে গেছি। ওপরের ডিজিটার্স গ্যালারি থেকে দেখলাম, বিশাল বিমানটা আকাশ থেকে নেমে মাটি ছুঁলো। একটু বাদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো যাত্রীরা। কিন্তু বিশ্বমামা কই? কয়েক শো লোক নামলো, তবু বিশ্বমামাকে দেখা যাচ্ছে না।

সবাই নেমে যাবার পর সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল একজন লম্বা লোককে।

আমার মাসকুতো দাদা বিলু বললো, ঐ দ্যাখ নাকেশ্বর খপখপে!

বিশ্বমামার আঁকালে আমরা তাঁকে ঐ নামে ডাকি। তাঁর সাতা শরীরের মধ্যে নাকটাই প্রথম দেখা যায়। এতবড় নাক-ওয়াল মানুষ বোধহয় আর কেউ নেবেনি। আর তাঁর গায়ের রঙটা সাহেবদের মতন।

অন্য যাত্রীদের কাঁধে কোলানো মোটা সোটা ব্যাগ, হাতে কত রকম ফিনিস-পত্র আর বিশ্বমামার সঙ্গে কিছুই প্রায় নেই। শুধু এক হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট। নাকি একটা কার্ড বোর্ডের ব্যাগ? দশ টাকার সলেনশ কিনলে যে-রকম ব্যাগ দেয়, সেই রকম।

সেই ব্যাগটাকে উঁচু করে ধরে খুব সাবধানে আসছেন বিশ্বমামা।

অন্যান্যবারে বিদেশ থেকে তিনি আমাদের জন্য নানা রকম চকলেট নিয়ে আসেন আর বড় বড় প্যাকেট ভর্তি ক্যান্ডি। এবার সে সব কিছু নেই? অন্য কোনো খাবার এনেছেন? ঐটুকু বাস্তব কী আর খাবার থাকতে পারে?

কান্টমাসের আয়গা পর হতে বিশ্বমামার অনেকটা সময় লাগবে। আমরা

অবীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বমামা একটা টুলিতে সুটকেস নিয়ে বেরলেন, এক হাতে সেই প্যাকেটটা উঠু করে ধরা।

আমাদের দেখে বিশ্বমামা এক গাল হেসে বললেন, কীত্রে, নীলু, বিলু, পিলু তোরা সব কেমন আছিস?

বিলুদা সুটকেসটা তুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে রাখলো। আমাদের দিকে একবার চোখ টিপে মাথা নড়লো। অর্থাৎ সুটকেসটা বিশেষ ভারী নয়। এর আগে একবার ক্যানাডা থেকে বিশ্বমামা এক সুটকেস ভর্তি পাথর এনেছিলেন। সেই সুটকেস বইতে বিলুদার জিত বেরিয়ে গিয়েছিল।

আমার তক্ষুণি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল যে বিশ্বমামা হাতের ঐ প্যাকেটটার কী আছে। কিন্তু মা বলে দিয়েছিল, হ্যাংলামি করবি না। বিশ্বকে দেখেই চকলেট চাইবি না। তোরা বড় হয়েছিস, এখন একটু ভদ্রতা সভ্যতা শেখ।

ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বাড়ি পৌছোনো পর্যন্ত। কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করতেই পিলু ফস করে বলে উঠলো, বিশ্বমামা, জোমার হাতের ঐ বাক্সটার কী আছে?

পিলু এখনও অনেক ছোট, ওর এখনো ভদ্রতা মানবার বয়েস হয় নি। বিশ্বমামা বললেন, আগে বল তো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ফসিলের কী সম্পর্ক?

পিলুর মুখ ওকিয়ে গেল, আমি তাকালাম জানলার বাইরে।

বিশ্বমামার স্বভাবই এই, কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবেন না। তার কবলে উল্টে অন্য একটা প্রশ্ন করে বসবেন। বিদঘুটে প্রশ্ন। হ্যাঁ, বিদঘুটেই তো। ফসিল কাকে বলে তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

বিলুদা জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বমামা, তুমি তো এবারে সাহারা মরুভূমিতে যুত্রে আসবে বলেছিলে?

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের কালক্রমি এই পশ্চিম বাংলার মধ্যে কী কী জঙ্গল আছে রে?



এ প্রসঙ্গের উত্তরও খেল।

আমি বললুম সবচেয়ে কাছে সুন্দরকন।

বিশ্বমামা বললেন, না, শুটা চলবে না। ওপারে অনেক মানুষ থাকে। আর?

আমি বললুম, মেনিনীপুরে আছে কীকড়াঝোড়া। উত্তরবঙ্গে অনেকগুলি জঙ্গল আছে। চাপভামরি, গোকমারা, হলং।

বিশ্বমামা বললো, হাঁরে বিলু, তোর পিসেমশাই বেঁচে আছেন?

বিলু বললো, না, তিনি স্বর্গে গেছেন।

বিশ্বমামা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাড়িটার এখন কে থাকে?

বিলু বললো, সেটা এখন এমনিই খালি পড়ে আছে। অনেকে বলে ঐ বাড়িতে নাকি ভূত আছে।

বিশ্বমামা বললেন, শুভ। ঐ রকমই চাইছিলাম। চল, ওখানে যাব।

বিলু বললো, এক্ষুণি?

বিশ্বমামা বললো, না, একুশি তো কাণ্ডা যাবে না। আগকের দিনটা বাড়িতে থেকে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

একথা শুনে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। কলকাতায় বেশি দিন থাকতে আমার ভালো লাগে না। কাল বাহিরে যাওয়া হবে, একটা কিছু আয়োজনার হবে।

বিলুদার পিসেমশাই ছিলেন পাগলাটে ধরনের মানুষ। ওঁর স্ত্রী মারা যাবার পর উনি বর্ধমানের জঙ্গল মহলে কী সব নাকি তত্ত্ব রাখা করতেন। একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি, কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই। তবে ঐ বাড়িতে নাকি ভূত ছিল।

বিশ্বমামা বৈজ্ঞানিক পদব্ধির ছেড়ে ইঠাৎ ভূত ধরতে চান নাকি? বিদেশ থেকে এসেই অমনি যেতে চান জঙ্গলে।

বাড়িতে এসে বিশ্বমামা প্রথমেই তার হাতের প্যাকেটটা সাবধানে রাখলেন আলমারির মাথায়।

তাঁর স্টুকেসের মধ্যে আমাদের জন্য কিছু টকি আর ক্যান্ডি এনেছেন বটে। বেশি না।

ছেট্ট প্যাকেটটার কী আছে তা যে জিজ্ঞেস করে তাকেই বিশ্বমামা হেসে

বলেন, মনে করো ঘোড়ার ডিম।

পরদিন ভোরবেলা আমরা যেখানে পড়লাম। বিশ্বমামা অনেক কী যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিলেন। পৌছতে লাগলো তিন ঘণ্টা। বর্ষমানের এই জঙ্গলটা তত বড় নয়, কিন্তু এক এক জায়গায় খুব নিবিড়। বিলুনার পিসেমশাইয়ের বাড়িটা প্রায় বাহা চূড়ো অবস্থার পড়ে আছে। সব ঘরগুলো খুলে ভর্তি। আমরা তানা খুলে খুলে ঢুকতে লাগলুম। এই রকম খালি-ফেলে-রাখা বাড়ির দরজা-জানালাও খুলে নিয়ে যায় চোরেরা। কিন্তু ভুতের ভয়েই বোধহয় চোরেরা এদিকে আসে না।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ। কতকাছি অনেক গাছ আছে, তাতেই আমার সুবিধে হবে।

দুটো ঘর সাফ করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাল ডাল আরও সব রান্নার জিনিসপত্র সঙ্গে আনা হয়েছে। বিলুনা রান্না করতে পারে। আর আনা হয়েছে কয়েকটা কাঁচা আম। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালোবাসেন বিশ্বমামা।

সেই রকম এক প্রেট কাঁচা আম কেটে সাজিয়ে নিয়ে বিলুনা জিজ্ঞেস করলো, বিশ্বমামা, এবার দয়া করে বলবে, তোমার ঐ প্যাকেটটাতে কী আছে?

বিশ্বমামা বললেন, ভুতেরা এখানে থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। ভুতদের বাঁত থাকে না, তারা কামড়াতে পারবে না। ভুতেরা সব নিরামিষাশী।

বিলুনা বললো, কথা বোরাতে পারবে না। আমরা কেউ ভুত-টুত মানিনি। ভূমিও ভুত ধরতে আসেনি তা জানি। ওটাতে কী আছে আমাদের বলতেই হবে।

—কেন, ঘোড়ার ডিমটা বুঝি পছন্দ হলো না?

—আমাদের কি খেলমানুষ পেরেছে, বিশ্বমামা?

—তোরা কেউ কামেরা এনেছিস?

—আবার কথা বোরাচ্ছে, ঘোড়ার আবার ডিম হয় নাকি?

—হয় না। তাই না? সেই জন্যই 'কিছু নেই' বোকাতে বাংলায় বলে ঘোড়ার ডিম। আচ্ছা, হাতির ডিম হয়?

—সবাই জানে হাতির বাচ্চা হয়।

—বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতি এদের কারুরই ডিম হয় না।

এবার আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য—কোনো জ্ঞান্যপায়ী প্রাণীর ভিন্ন হয় না, বাচ্চা জন্মার—বললুম।

বিশ্বমামা বললেন, আমি বলি বলি, হাতির চেয়েও বড় কোনো প্রাণীর বাচ্চা হয় না। ভিন্ন হয়।

আমি মাথা চুলকে বললুম, হাতির চেয়ে বড় প্রাণী? তা হলে কী ভিন্নি মাছ?

বিশ্বমামা বললেন, বাগানে চল। আমার বয়সপাতিগুলো সঙ্গে নে।

বিলুমা বললো, সেগুলো গাড়িতে আছে। নামানো হয়নি।

সবাই গেলো গাড়ির কাছে। সেখান থেকে নামানো হল অনেক জিনিসপত্র। একটি বেশ বড় ধরনের কাচের বাস্ক দু'হাতে তুলে বিশ্বমামা বললেন, এটা আমার বিশেষ আবিষ্কার, জানিস তো?

একটা কাচের বাস্ককে আবার আবিষ্কার করার কী আছে কে জানে। সেটাকে নিয়ে বিশ্বমামা বাগানের এক জায়গায় বসলেন। বাস্কটার সঙ্গে জুড়ে দিলেন কয়েকটা মেটর, আরও সব কী কেন।

সেই কাচের বাস্কটার একটা মরজা আছে। সেটাকে খুলে বিশ্বমামা রাখলেন তার সেই বহু মূল্যবান প্যাকেটটা।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে আমি গোবি আর সাহারা মন্ত্রভূমিতে কতকগুলি ফসিল দেখতে গিয়েছিলাম জানিস তো।

তারপর পিলুর দিকে ফিরে বললেন, 'বরাসপোরাস টাগোরাই' কী—জানিস না? এক ধরনের ফসিল। ডাইনোসরের ফসিল। এটা পাওয়া গিয়েছিল গোদাবরী নদীর কাছে। ডাইনোসরেরা যেমন অতিকার প্রাণী, সেরকম লেখক-কবিরের মধ্যে অতিকার মানে সবচেয়ে বড় কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরিজিতে বলে রবীন্দ্রনাথ টেপোর, তার থেকে টাগোরাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষ্যে ঐ ডাইনোসরের ফসিলের নাম রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামে।

এবার বিশ্বমামা খুব সাবধানে প্যাকেটটা খুললেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। সেখা কিছুই বোঝা গেল না। অনেকটা লম্বাটে চমচমের মতন একটা জিনিস। শক্তিগড়ের ল্যাচার মতন। কিন্তু সেটা যে বাবার জিনিস

না, তা নিশ্চিত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী?

বিশ্বমামা বললেন, এখনো বুঝলি না, মীলু? এটা একটা ডিম।

ডিম? যাঃ কী বলছে। ডিম কখনো লম্বা হয়?

কেন হবে না? এটা যে প্রাণীর ডিম, সেটাও যে খুব লম্বা।

কেন প্রাণীর ডিম?

গোবি মরুভূমিতে ডায়নোসরের ফসিল, অর্থাৎ প্রাণীর পাওয়া গিয়েছিল। সেটা দেখে বোকা পিয়েছিল ওদের ডিম কেমন হয়। তারপর হঠাৎ এবার সুইজারল্যান্ডে মাটিরহর্প পাখাড়ের বরফের মধ্যে এই ডিমটা আমি আবিষ্কার করেছি। বরফের অনেক নীচে ছিল, তাই এটা নষ্ট হয়নি। খুব সম্ভবত এটা ফুটিয়ে বাচ্চা বের করা যেতে পারে। এই কাচের বাগ্গটা হচ্ছে একটা নতুন ধরনের ইনকিউবেটর। এটার মধ্যে থাকলে শুধু যে ডিম ফোটানো যাবে তাই-ই না, বাচ্চাটিকে অনেক ভালোভাবে বড় করা যাবে।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, এটা থেকে ডায়নোসর জন্মাবে? ওরে সর্বনাশ!

বিশ্বমামা বললেন, ডায়নোসর কী আছে? ডায়নোসর আসলে কী বলতো? খুব বড় সুইজের টিকটিকি। একটা টিকটিকিকে এক হাজার গুণ বড় করে মনে মনে ভাব। টিকটিকি কি মানুষকে কামড়ায়? বেশির ভাগ ডায়নোসরই খাস পাতা এই সব নিরামিষ খেত। যে সব গুলু নিরামিষ খায়, তারা চুষে মানুষকে কামড়ায় না! হাতির কথা ধর, হাতি মানুষকে কক্ষণো কামড়ায় না। মানুষ বেশি বিরক্ত করলে হাতি তাকে ঠেঁকে ছড়িয়ে আশ্বস্ত করে।

আমি বললাম, এখনকার পৃথিবীতে একটা বিরাট ডায়নোসর জন্মাবে, তা কি সম্ভব?

বিশ্বমামা বলল, সম্ভব কি অসম্ভব তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

বিশ্বমামা একবার ইনকিউবেটরটা চালু করে দিলেন। তারপর অবিস্থান্য সর কাঁড় ঘটতে লাগল।

দশ মিনিট বাদেই ফাঁট করে ডিমটা ফেটে গেল। ফটার শব্দ হলো

ব্রীটিশমতন। আমরা বুকে দেখলুম, তার মধ্যে কী একটা কিলবিল করছে।

বিশ্বমামা আনন্দে টিংকার করে বলে উঠলেন, বেঁচে আছে, বেঁচে আছে!  
আম খণ্টার মধ্যেই সেই জিনিসটা মাথা তুললো। ঠিক টিকটিকির মতনই  
মাথা।

আরও আশঙ্কটার মধ্যে সেটা আর একটু বড় হতে ছিকটিকির বসলে মনে  
হলো গিরগিটি।

বিশ্বমামা ফিসফিস করে বললেন, ব্রনটোসরাস। এরা খুব নিরীহ। সারা  
পৃথিবী চমকে যাবে। এটার জন্য হাওড়া স্টেশনের সহিলের একটা খাঁচা বানাতে  
হবে।

বিলুলা বললেন, দ্যাখ না কী হয়!



সেই গিরপিটিটা ক্রমশ বড় হতে লাগলো। নিঠের দিকটা উঁচু হয়ে গেল আর ল্যাজটা লম্বা হলো অনেকখানি।

এক সময় সে প্রাণীটার মাঝা ঠেকে গেল কাঁচের বাস্কেটের ভেতরে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শুকি আরও বড় হবে? ওর মধ্যে কী করে বড় হবে?

বিশ্বমামা বললেন, ব্রনটোসরাস কাঁচের বাস্কেট ফাটিয়ে ফেলবে।

লিনু ভয় পেয়ে বললো, ওরে বাবা, আমি পালাচ্ছি!

এরপরই অস্বুত একটা ব্যাপার হতে লাগলো। সেই প্রাণীটা আরও বড় হওয়ার বদলে ছোট ছোট করতে লাগলো কাঁচের বাস্কেটের মধ্যে। যেন ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। গায়ে ফেন কিছু ফুটছে। যত্নশীল গড়াগড়ি দিল কয়েকবার।

বিশ্বমামা ইনকিউবেটরের ইলেকট্রনিক চার্জ বন্ধ করে দিলেন।

প্রাণীটা তবু গড়াগড়ি দিতে দিতে কুকড়ে যেতে লাগলো।

লিনু বললো, ছোট হয়ে যাচ্ছে। আবার ছোট হয়ে গেল!

সত্যিই তাই! কুকড়ে-মুকড়ে ছোট হতে হতে সেটা আমার একটা টিকটিকির মতন হয়ে গেল।

বিশ্বমামা হতাশ ভাবে বললেন, বিবর্তনবাদ! বিবর্তনবাদ! এখনকার পৃথিবীতে আর ডায়নোসর অস্ত্রান্তে পারবে না! সব ডায়নোসর টিকটিকি হয়ে গেছে।

আমরা এত অবাক হয়ে গেছি যে কেউ আর কথা বলতে পারছি না।

বিশ্বমামা আবার আর্টনাদ করে বললেন, ক্যামেরা আনলি না? ছবি তুলে রাখলি না? অনেকটা বড় হয়েছিল। সবাইকে ছবি তুলে দেখাতাম। হায়, হায় হায়।

ক্যামেরা ছিল বিলুলার গাড়িতে। কিন্তু আমার সেকথা মনেই পড়ে নি। সত্যি একটা টিকটিকির মতন প্রাণী বড় হতে হতে ডায়নোসরের মতন চেহারা নিগিল। কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে?

ছবি তোলা হলো না বলে বিশ্বমামা মাথা চাপড়ে হায় হায় করতে লাগলেন!

## বিশ্বমামার আবিষ্কার

**রা**নীমঞ্জু স্টেশনে নেমে আরও সতেরো মাইল দূর বিশ্বমামার দাখার বাড়ি। জিপ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। একটা জিপ গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আসলে স্টেশনের বাইরে ছিল চার পাঁচখানা জিপ গাড়ী। সেখান থেকে একজন ছাত্রী আর একজন ছাত্র এসে বিশ্বমামার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললো, আসুন স্যার।

ছাত্রী আর ছাত্রকে বিশ্বমামা আগে দেখেন নি। সেও বিশ্বমামাকে কখনো দেখেন নি। তবু সে এত লোকের ভিড়ে বিশ্বমামাকে চিনলো কী করে?

ছাত্রী আর ছাত্রকে সে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, এ তো স্যার খুব সোজা। বউদি বলে দিয়েছেন, দেখবে একজন লম্বা মতন লোক, গায়ের রং খুব ফর্সা, আর নাকটা গভীরের শিং-এর মতন। আর সঙ্গে থাকবে দুটি বাচ্চা ছেলে।

বিলুনা বললেন, গভীরের মতন নাক? ভাগ্যিস উনি বলেন নি হাতের ঠোঁড়ের মতন।

বিশ্বমামা নিজের লম্বা, চোখ নাকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, গভীরের শিং-এর মতন নাম তো খারাপ কিছু নয়। আর তোদের যে বাচ্চা ছেলে বললেন।

বিলুনা বললেন, একটু ভুল বলেছে। আমি বাচ্চা নই, নীলু বাচ্চা। ছাত্রী আর ছাত্র নাম বাচ্চা সোজা। সে সাঁওতাল হলেও বাংলা বলে জলের মতন। ইংরিজিও খানিকটা জানে। বাচ্চা পছন্দ করবে বয়েস হবে। বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

রানীমঞ্জু ছাড়িয়ে জিপ গাড়িটা বেতে লাগলো। একটা সরু রাস্তা দিয়ে। সরু তো বটেই, তাছাড়াও রাস্তার অবস্থা ভালো না, একটো-দুটো, মাঝে-মাঝে বড় বড় খানা-বন্দ। এখনো এখনো-সেখানে জল জমে আছে। আমরা চলেছি লাফাতে লাফাতে। তাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বেড়াতে বেড়ালেটিই আনন্দের ব্যাপার।

একটু পরেই বাস্তাটা চুকে গেল একটা জঙ্গলের মধ্যে। কত রকম গাছ। আমি কিংবা বিলুনা অতশত গাছ চিনি না। বিশ্বমামা আমাদের গাছ চেনাতে লাগলেন। শাল, মহুয়া, জারুল, পলাশ, কুম্ভচূড়া, রাখাচূড়া আরও কত কী। অনেক গাছে ফুল ফুটে আছে। আমরা অনেক গল্পে এই সব গাছের নাম পড়ি। কিন্তু জারুলের সঙ্গে শিমুলের কী তফাৎ তা জানি না।

বিশ্বমামা বললেন, আনিস তো এর মধ্যে অনেক গাছই আমাদের দেশের নয়। বিশেষ থেকে আনা হয়েছে। এই দ্যাখ না। এই যে কুম্ভচূড়া। কী সুন্দর নাম। এই গাছ আনা হয়েছে ম্যাডাগাস্কার থেকে। এখন আমাদের দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বমামা যে গাছটাকে কুম্ভচূড়া বলে দেখালেন, বাস্তা সোরেন সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটা তো গুলমোহর।

বিশ্বমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, অই নীলু, বল তো গুল মানে কী? আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

বিশ্বমামা বললেন, তোরা কথায় কথায় এত গুল মারিস, আর গুল কথটির মানেই জানিস না? বিলু তুই জানিস?

বিলুদার অবস্থাও আমার মতন।

বিশ্বমামা বললেন, গুল মানে ফুল। বাস্তা যে বললো গুলমোহর, সেটা ঠিক নয়। আমরা যে ফুলকে বলি কুম্ভচূড়া, হিন্দীতে তাকেই বলে গুলমোর। মোহর নয় মোর। মোর মানে ময়ূর। ময়ূরের পাখির মতন ফুল। বটো না মিললেও ফুলটি দেখতে অনেকটা ময়ূরের পালকের শেষ নিকটার মতন। কুম্ভের মাথায় একটি ময়ূরের পালক থাকে, তাই বাংলার বলি কুম্ভচূড়া আর হিন্দীতে গুলমোর।

মুখ ফিরিয়ে তিনি ভিজ্জেন করলেন, আচ্ছ বাস্তা, তোমরা পলাশকে কী বলে?

বাস্তা একটু চিন্তা করে বললেন, আমি তো পলাশই বলি, ইংরেজিতে বলে ফ্রেইম অফ দ্য ফরেস্ট।



বিশ্বমামা বললেন, ঠিক বলেছে তো। যখন এক সঙ্গে অনেক পলাশ ফুল ফোটে, তখন সমস্ত জঙ্গল কেন ছালাতে থাকে। বাংলায় কিন্তু পলাশের আর একটা নাম আছে। নীলু আর কিলু, যদি সেই নামটা বলতে পারিস ফিরে গিয়ে তোদের একদিন চাইনিজ রেস্টোরাঁয় খাওয়াবো।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বাস্তা জিজ্ঞেস করলো, কী নাম? বাংলায় অন্য কী নাম আছে?

বিশ্বমামা বললেন, কিংগুক। সংস্কৃত কথা। কোথায় পলাশ আর কোথায় কিংগুক। এই কিংগুক নামটা কিন্তু খুব মজার। চেনা-জানা আর কোনো ফুলের এরকম নাম নেই।

গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে উঠলো। সামনের সিটে হুকে গেল বিলুদার কপাল।

বাস্তা বললো, আর বেশি দেরি নেই। ই তো কারখানার চিমনি দেখা যাচ্ছে।

হাত দিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, কিংগুক নামটা কেন মজার?

বিশ্বমামা বললেন, এটা নামই নয়, এটা একটা প্রশ্ন। কিংগুক? কিয় বুঝলি? বিলুদা বললেন, কী করে বুঝবো, আমি কি সংস্কৃত পড়েছি নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, সংস্কৃত পড়ার দরকার নেই। মাঝে মাঝে বাংলা অভিধান দেখলেই এসব জানা যায়। গুক মানে জানিনি তো?

আমি বলে উঠলাম, 'আমি জানি, আমি জানি, এক রকম পাখি'।

বিশ্বমামা বললেন, কী পাখি?

আমি বললাম, গল্পের বইতে গুক আর সারি এই দুটো পাখির নাম পড়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, গল্পের বইয়ের কথা ছাড়া। আমরা যাকে টিয়া পাখি বলি, আগেকার দিনে তারকেই কলা হতো গুক পাখি। এখন পলাশ ফুলের ডগার দিকটা লক্ষ্য করে দেখবি, অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতন। তাই এক সময় কোনো এক কবি মনে মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিং গুক? সত্যিই কি গুক বা টিয়া পাখির

মতন? সেই থেকে কিংকন নাম হয়ে গেছে।

বাক্সা জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনি বুধি যেটামি পড়েছেন?

বিশ্বমামা বললেন, কখনো না। আমি ডিকশনারি পড়ি।

একটু পরেই আমরা পৌঁছে খেলার বিশ্বমামার মামার বাড়ি—আমার মায়েরও মামা বাড়ি। সুতরাং আমাদের দাদুর বাড়ি। কিন্তু এই দাদুকে আমরা কখনো দেখিনি।

দাদুর নাম জগদীশ, বিশ্বমামা তাকে ডাকেন জগুদাদা বলে। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, বুড়ো বলে মনে হয় না। তিনি এখানে একটা ছোটখাটো কারখানা তৈরি করেছেন, এখানেই থাকেন, শহরে বিশেষ যান না। তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বমামা বলেন নতুন মামী। সুতরাং আমাদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন নতুন দিদিমা।

কী যত্নই যে করতে লাগলেন তিনি। সব সময় আমাদের নতুন নতুন কী খাওয়াচ্ছেন সেই চিন্তা। বিশ্বমামা ঊৎসাহের সঙ্গে বলেন, নতুন মামী, আরও খাওয়াও, তোমাদের এখানে খেতেই হো এসেছি।

কারখানাটি একটু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে জগদাদুর বাসলো। অনেকগুলো ঘর, সামনে বাগান, পেছনে একটি পুকুর। হাঁস, মুর্গি, গরু আছে নিজস্ব।

বাক্সা সোয়েনকে আমরা প্রথমে ক্রীড়ার ভেবেছিলাম, পরে বুঝলাম সে এখানকার প্রায় ম্যানেজারের মতন। জগদাদুর তান হাত বলা যায়। এই বাক্সালা জিপ গাড়ি নিয়ে সকাল বিকেল আমাদের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনে। বাক্সালার বাড়িও কাছেই। বাক্সালার একটি সাত-আট বছরের ছেলে আছে, তার নাম জ্যোৎস্না তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাল জমে গেল।

এই জ্যোৎস্নাই এই গল্পের নায়ক।

জ্যোৎস্না কথা খুব কম বলে, খেলতে ভালোবাসে। প্রত্যেকদিন সকালে ওর সঙ্গে আমরা ফুটবল খেলি, একটা রবারের বল নিয়ে। সেই বলটা নিয়েই আবার ক্রিকেটও খেলা হয়। অন্য বল নেই।

জ্যোৎস্না আবার নিজে ছবি আঁকে। ওসের বাড়ির সামনে একটা সিমেন্ট বাধানো চাতাল আছে। সেই চাতালের ওপর খড়ি নিয়ে আঁকে বড় বড় ছবি।

ওর আঁকার হাত আছে, শেখালে ও একদিন ভালো শিল্পী হতে পারবে।

জাশো সাধারণ ছবি আঁকে না। যোড়া একে দুটো ডানা জুড়ে দিয়ে বলে পক্ষীরাজ। মানুষ একে তার মস্তবড় কুলোর মতন কান জুড়ে দিয়ে বলে অন্য গ্রহের মানুষ। জাশোর যখন ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়, তখন সে খেলতেও চায় না।

আমাদের সঙ্গে জাশো মাঝে মাঝে বেড়াতে যায়। আবার এক একসময় যায় না, তখন ছবি আঁকে।

একদিন আমরা একটা পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে বাস্তাদের বাড়িতে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি চা খাওয়ার জন্য। জাশো ছবি আঁকছে চাতালে।

বারান্দায় ডান দিকে একটা মস্ত বড় উনুন জ্বলছে লাউ লাউ করে। ওটা সব সময় জ্বলে। নেভাতে দেখিনি কখনো। ঐ উনুনে চায়ের জন্য জল চাপানো হয়েছে।

বিলুদা বললো, বাস্তাদা, তোমাদের এখানে কয়লা খুব শক্ত, তাই তোমরা সব সময় উনুন জ্বালিয়ে রাখো। লেশলাই কাঠির খরচ বাঁচাও।

বাস্তাদা হেসে বললো, শক্ত মানে কী, আমাদের সব কয়লা তো বিনা পরসায় বলতে গেলে।

বিশ্বমামা হিঃহেস করলেন, বিনা পরসায় কেন? কাছাকাছি অনেক কয়লার খনি আছে? কেউ বুঝি তোমাদের বিনা পরসায় কয়লা দেয়?

বাস্তাদা বললো, অন্য কেউ দেবে কেন? আমাদের নিজস্বেরি তো কয়লার খনি আছে।

বিশ্বমামা বললেন, জগদমামার কয়লাখনি আছে ওনিনি তো। কোথায় সেটা?

বাস্তাদা বললো, সে মহার ব্যাপার শোনেন নি? আপনার জগু মামা গত বছর ঐর বাগানের পেছনে একটা পুকুর খোঁড়াছিলেন। এখানে তো শক্ত পাথুরে মাটি, পুকুর খোঁড়া সহজ নয়। তার ফুট খুঁড়তে না খুঁড়তে ঠং ঠং করতে লাগলো। কোদাল, পঁহিতি চালিয়ে মজুররা ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল তলা

থেকে মটির বদলে বেতলেছে কয়লা। বেশ ভালো জাতের কয়লা। সরাসরি উনুনে এনে খালানো যায়। পুকুরের বদলে আমরা পেয়ে পেলাম একটা কয়লার খনি।

বিক্রমাদা বললেন, সঠিই তো মজার ব্যাপার! কিন্তু এখন কয়লাখনি নব গন্তর্গমেষ্ট নিয়ে নেয় না?

বাক্তাদা বললো, সরকারের লোকদের জানানো হয়েছে। আপনার জগু মামা কখনো বে-আইনি কাজ করবেন না। সরকারি লোক এসে পরীক্ষা করে দেখে বলেছে, কয়লা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু জায়গাটা বেশি বড় নয়। ঐ পুকুরের মাঝেই ঐ টুকু জায়গাতে কী করে ফেন কয়লা জমে আছে। এইটুকু কয়লা খনি সরকার নিতে চায় না। আমরাই ব্যবহার করতে পারি। ঐ কয়লাতে আমাদের আরও তিন চার বছর চলে যাবে।

বিলুা বললো, তাই সেখানি ঐ পুকুরটার কী রকম কালো কালো নোয়ো জল।

বাক্তাদা বললেন, একটুখানি মোটে জল আছে। পাম্প করে খোঁলা যায়। তারপর আমরা সরকার মতন কয়লা কেটে নিই।

এরপর চা বেতে খেতে আমরা কয়লার গল্প ছেতে অন্য গল্প করতে লাগলাম।



এক সময় বিশ্বমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সেখি তো, আমাদের জাখো সাহেব কী ছবি আঁকছে।

আমরাও দেখতে পেলাম।

মেঝেতে ইঁটু গেড়ে বসে জাখো খড়ির বসলে একটা খসখসে পাখরের মতন জিনিস দিয়ে বড় করে কী যেন আঁকছে।

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছ কিসের ছবি আঁকা হচ্ছে জাখো?

জাখো গম্ভীর ভাবে বললো, এটা একটা গাছ। আর এই যে ফুলগুলো দেখলে, এগুলো সব এক একটা হীরে।

আমি বললাম, সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা ফাঁক করে হেসে বললো, গাছে হীরে ফলছে। তাও এক একটা হীরে তালের মতন বড়।

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, হাসছিলি যে। গাছে কি হীরে ফলে না?

বিলুদা ইয়ার্কি করে বললো, ফলে বুঝি? তুমি সেবেছো? কোথায়, কামস্টার্টকা না ম্যাডপাডার?

বিশ্বমামা জাখোর হাতের পাখরটার নিকে এক নৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ওটা একবার সেখিতো জাখো।

নোটা হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে কিরিয়ে নেবে, ঝেঝেতে দাপ কাটিতে লাগলেন। অনেকটা প্লেট পেন্সিলের মতন দাপ পাড়লো।

বিলুদা বললো, ওটাও হীরে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, না, এটা গ্রায়ফাইট। কাকে গ্রায়ফাইট বলে জনিস?

তারপরেই লাকিয়ে উঠে বললেন, এখুনি জগু মামার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

সৌড়াতে সৌড়াতে বাংলাতে গিয়ে বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, জগুমামা, তোমাকে একটা অনুরোধ করবো? কালকেই অনেকগুলো মজুর লাকিয়ে তোমার পুকুরের সব কয়লা কাটিয়ে ফেলতে পারবে? কয়লা ওপরে জমা করে রাখলেও তো নষ্ট হয় না।

জগু বাবু বললেন, কেন, সব কয়লা একসঙ্গে কটাতে হবে কেন?  
বিশ্বমামা বললেন, আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা  
করবো।

জগুমাঝে আপত্তি করলেন না। বিশ্বমামা নাম করা বৈজ্ঞানিক। তিনি নিতান্ত  
বাক্সে কথা বলবেন না। যখন সব কয়লা তুলে ফেলতে বললেন, নিশ্চয়ই কোনো  
বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু মুক্তি হল, বিশ্বমামা কিছুতেই তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলবেন  
না। আমাদের কাছে বারবার বলতে লাগলেন, গাছে হীরে ফলে না। সোনার পাশে  
হীরের ফুল।

বিলুদা বললো, কয়লা সব শেষ হলে তারপর বুধি হীরের খনি বেরবে?  
বাক্সদা বললো, এটিকে এত খনি আছে রনিগঞ্জ, করিয়া, আসনসোল,  
কোনো খনিতে কখনো হীরে বেরিয়েছে বলে শুনিনি।

পরদিনই পঞ্চাশ জন মজুর কাজে লেগে গেল। বিশ্বমামা নিজে তদারকি  
করতে লাগলেন কাজের। সব সময় ওদের মধ্যে লেগে রইলেন। নিজে হাত  
লাগেন মাঝে মাঝে। ওঁর জামা কাপড়ে সব কয়লার ঠোঁড়ো সেধে একেবারে  
কালো ভুত হয়ে পেলেন।

তারদিন পর দেখা গেল কয়লার স্তর খুব গভীরে নয়। তলার পাওয়া যাচ্ছে  
নরম মাটি। সব কয়লা তুলে ফেলার পর সেই নরম মাটি খুঁড়ে পরিষ্কার আল  
বেরতে লাগলো। এবার সেটা সত্যিকারের একটা পুকুর হয়ে গেল।

আমি আর বিলুদা বিশ্বমামাকে চোখে ধরে বললুম, কোথায় গেল তোমার  
সোনার গাছ আর হীরের ফুল?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, আমার বিশ্বমামা একটা পুকুর কাটাতে  
গিয়ে কয়লা সেধে থেমে গিয়েছিল। আমি কয়লা সব তুলিয়ে পুকুরটা পুরো  
করে নিলুম। কয়লাও পাওয়া গেল। পুকুরও পাওয়া গেল, বাস!

জগুদাদু বললেন, আমি তাতেই বুধি। বেশ করেছিল বিশ্ব। একটা পুকুরের  
বড় দরকার ছিল। তাতে মাছ চাষ করবো। পরের বার এলে তোদের পুকুরের

মাছ পাওয়াযো।

বিশ্বমামা বললেন, দাঁড়াও জগদামা, এই বিলু আর নীলু গবেট দুটোকে একটা জিনিস দেখাই। গাছে হীরে ফলে না। তবে এটা কী?

ফল করে পকেট থেকে তিনি একটা পাখরের টুকরো বার করলেন। তার একটা নিক চকচক করছে, আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

জগদাদু অবাক হয়ে বললেন, এ তো দেখছি সত্যিই একটা হীরে! কোথায় পেলি?

বিশ্বমামা বললেন, তোমার পুকুরে। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলুম, প্রত্যেকটা কয়লার টুকরো যাচাই করে নেখেছি। এই একটিই পাওয়া গেছে। একটা অমৃত না পেলে ভায়ে দুটোর কাছে আমার প্রেসিডার পাকের হয়ে যেত।

আমাদের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলি তো? পাছ লক্ষ লক্ষ বছর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেলে কয়লা হয়ে যায়, তা জানিস তো? সেই কয়লা থেকে গ্রাফাইট, তার থেকে হীরে। তা হলে পাছ থেকেই হীরের জন্ম নয়?

জগদাদু বললেন, এমিকরর কোনো খনিতে কখনো কেউ পায়নি। কুই কী করে বুঝলি, এখানে হীরে থাকতে পারে?

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের জাম্বোর হাতে গ্রাফাইটের টুকরোটা দেখে। অবশ্য গ্রাফাইট থাকলেই যে হীরে থাকবে তার কোনো মানে নেই। তবু একটা চাপ নিলাম। ক্ষতি তো কিছু ছিল না।

হীরের পাখরটা হাতে নিয়ে আমরা সবাই নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। সত্যি সত্যি হীরে!

বিশ্বমামা বললেন যে, এখন অনেক কাজাকুটি করতে হবে। ঠিক মতন কাটতে না পারলে এর থেকে জোন্না বেয়েয় না। তবে এটা যে আসল হীরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিলুদা বললেন, গ্রাফাইট থেকে যদি হীরে হয়, তা হলে গ্রাফাইটে খুব চাপ দিলে আরও হীরে বানানো যায় না।

বিশ্বমামা বললেন, না রে গবেট, সম্ভব নয়। কয়লা জিনিসটা আসলে কী?

কার্বন। গ্র্যাফাইটও কার্বন, হীরেও কার্বন। কিন্তু এদের পরমাণুর বিন্যাস আলাদা আলাদা। প্রকৃতির খেলালেই এরকম হয়, আমাদের সাধা নেই পরমাণু বিন্যাস বলপাখার।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, জগদমামা, এ হীরেটা যে অবিদ্ধার করেছে, তারই পাওয়া উচিত। যদিও তোমার পুত্রের থেকে উঠেছে।

জগদাদু বললেন, তুই নিতে চান তো নে, আমার আপত্তি নেই।

বিশ্বমামা বললেন, আমি কেন নেব? আমি তো অবিদ্ধার করি নি। সে কৃতিত্ব জগদাদুকে দিতে হবে। জগদাদু যদি একটা গাছে হীরের ফুল না আঁকতো, তা হলে ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসতো না। সেখো, বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বের চেয়েও মানুষের কল্পনা কত শক্তিশালী। ঐটুকু একটা ছেলে, একটা গ্র্যাফাইটের টুকরো পেয়েই হীরের ফুল আঁকছিল কেন? এই হীরেটা আমরা জগদাদুকেই উপহার দেবো।

সবাই মিলে আমরা ডাকডাক লাগলুম, জগদাদু, জগদাদু—।

পরদীপ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (১৯৭৪)-এ গল্পটি 'হীরে কি গাছে ফলে?' নামে প্রকাশিত হয়েছে।





## বিশ্বমামার কারসাজি

বিশ্বমামা বললেন, স্ট্রেসবেলার একটা ম্যাজিক সেবেছিলাম, বুঝলি! আজও সেটা ভুলতে পারি নি।

আমি বললুম, তুমি মোটে একটা ম্যাজিক সেবেছে? আমরা তো কত ম্যাজিক সেবেছি। পি সি সরকারের জাদুর খেলা সেবেছি অনেকবার।

বিশ্বমামা বললেন, আমিও কম ম্যাজিক সেবিনি। সব তো মনে থাকে না। সব মনে রাখার যোগ্যও নয়। এই একটা ম্যাজিকের কথা মনে খুব দাগ কেটে গিয়েছিল। আমরা তখন উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রিটে থাকি। মিঃ ফক্স নামে একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, কালের রঙের প্যান্ট-কোট আর মাথায় একটা লম্বা টুপি পরতেন। আসলে কিন্তু বাঙালি, এরকম নাম নিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। আমাদের ইন্ডুলে একবার ম্যাজিক সেখিয়েছিলেন, অনেক সময় তো বড় রাস্তার মোড়ে লাড়িয়েও হঠাৎ ম্যাজিক সেবাতে শুরু করতেন।

বিলুদা বললো, রাস্তার ম্যাজিশিয়ান? তার মানে তো এলোবেলো।

বিশ্বমামা বললেন, নাহে, সেটাজে বাঁড়িয়ে ম্যাজিক সেখানোই বরং অনেক সোজা। সেখানে অনেক যত্নপাতির কারসাজি থাকে। কিন্তু রাস্তার, সকলের চোখের সামনে খালি হাতে ম্যাজিক সেখানোর কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

বিলুদা বললো, খালি হাতে কেউ ম্যাজিক সেখায় না। আমি শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানদের কোটের পকেটে সব সময় কিছু ম্যাজিকের জিনিসপত্র থাকে। ওরা যে তাদের প্যাকেট নিয়ে খেলা দেখায়, সে-ও তো সাধারণ ভাস নয়।

বিশ্বমামা বললেন, তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তবে ভালো ম্যাজিশিয়ানরা খালি হাতেও কিছু কিছু খেলা দেখাতে পারে। সেটা হাতের কায়না। মিঃ ফক্সের তোমর নাম ছিল না, কিন্তু সত্যি ভালো ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। কাচের গেলাস খেয়ে ফেলতেন, একটা কুমাল খেড়ে পায়রা বার করতেন, এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে দিতেন চোখের নিম্নে। এগুলো এমন কিছু না। কিন্তু আর একটা যে ম্যাজিক সেখিয়েছিলেন—

বিলুদা বাধা নিয়ে বললো, ম্যাজিকের গর তখনো চাই না। তুমি একটা ম্যাজিক দেখাও।

বিশ্বমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, যাঃ, তবে বলবো না! ম্যাজিক দেখতে চান, জানাকে দেখাতে হবে কেন, চারপাশে তাকালেই তো দেখতে পাবি। এই যে ফোঁটা ফোঁটা জলে সূর্য কিরণ পড়লে মজা বড় একটা রামধনু হয়ে যায় এক এক সময়, সেটা একটা ম্যাজিক না? সেটা হলো আকাশের ম্যাজিক। বটগাছের ফল দেখেছিল, এইটুকু একটা মেটে রঙের গুলির মতন, তার মধ্যে আবার খুসে খুসে বিড়ি আছে। এইটুকু একটা বটফল থেকে একটা বিশাল বটগাছ হয়, এটা ম্যাজিক বলে মনে হয় না? প্রকৃতির মধ্যে এরকম কত ম্যাজিক আছে।

আমি বিলুদার দিকে তাকিয়ে বললুম, আঃ, চূপ করো না। গল্পটা তখনো লাগে। বিশ্বমামা, ছোমার মিস্টার ফজলের গর বলো।

বিশ্বমামা বললেন, তনবি? মিস্টার ফজল অনেক ম্যাজিক দেখাতেন, কিন্তু একটা ম্যাজিকই আমার মনে সোঁথে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য রাত্তার মোড়ে নয়, স্টেজেই দেখিয়েছিলেন। সেই ম্যাজিকটার নাম 'জাদু গাছ'! প্রথমে তিনি একটা হলুদ পাতিলেবু হাতে নিজে সবাইকে দেখালেন। তারপর স্টেজের ওপর রাখা একটা টবে সেই নেবুটা আশুই পুতে দিলেন। তারপর টবটার ওপর একটা কালো কাপড় ঢাকা নিয়ে কোণের পকেট থেকে বার করলেন একটা কাচের শিশি। তিনি বললেন, এর মধ্যে কী আছে জানেন? এক রকম আশ্চর্য সার, অর্থাৎ ফাটলাইজার। পৃথিবীর আর কেউ এই সারের খবর জানে না। এই সার নিলে কী হয় দেখুন। তিনি কালো কাপড়টার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেই শিশি থেকে ঝমিকটা কী যেন ফেলে দিলেন। তারপর কালো কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই টবে একটা পাতিলেবু গাছ গজিয়ে গেছে।

বিলুদা ঠোট উল্টে বললো, এ আবার হয় নাকি?

আমি বললুম, চূপ।

বিশ্বমামা বললেন, ছোমার সামনেই দেখলাম তো! স্টেজে আর কেউ আসে নি। এখানেই শেষ নয়। মিস্টার ফজল গাছটার কালো কাপড় ঢাকা দিলেন।

আবার শিশি থেকে কিছু ঢাললেন। এরপর কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই প্লাস্টায় পাঁচ ছটা পানি লেবু ফলে আছে। সত্যি সত্যি লেবু, কাগজের নয়। আমরা হাত নিয়ে টিপে টিপে দেখলাম।

বিলুনা বললো, এ আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না।

বিশ্বামা বললেন, তোরা সবজ্ঞাত হয়ে গেছিস। আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম। আমার ভবন এগারো বছর বয়েস। ঐকু বুঝতে শিখেছি যে এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে ফেলা নিশ্চয়ই হাতের কারসাজি। এরকম হতে পারে না। যদি সত্যিই সম্ভব হতো, তা হলে মিস্টার ফক্স অনেকগুলো এক টাকার নোটকে একশো বানিয়ে বড়লোক হয়ে যেতে পারতো। তা তো হয় নি, লোকটি বেশ গরিবই ছিল, বুড়ো বয়েসে হেঁচা কোট পায়ে মিত। কিন্তু ঐ গাছ তৈরির ব্যাপারটার আমার ঝটকা লেগেছিল। সার নিলে সব গাছই বাড়ে। মিস্টার ফক্স হয়তো এমন কোনো শক্তিশালী সার আবিষ্কার করেছেন, যাতে কয়েক মিনিটে গাছ বড় হয়ে যায়।

বিলুনা বললো, তা হলে তো খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায় পৃথিবীতে। ধান গাছ পঁতে ফসলের জন্য আর কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয় না। এক জমিতে একশো দুশো বার চাষ করা যায় বছরে। আজকে একটা কলাগাছ পঁতলে কালকেই এক ছড়া পাকা কলা পাওয়া যাবে। কোনো কিছুই অভাব থাকবে না।

বিশ্বামা বললেন, অম্বিও সেইরকম ভেবেছি। মিঃ ফক্স তো পাড়ার লোক, তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, ঐ গাছের ম্যাজিকটা কি সত্যি? উনি ধমক দিয়ে বলতেন, সত্যি না তো কী। আমি মিথ্যে কিছু দেখাই না। যা ভাখ এখন থেকে। আমি গাছপালা নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলাম। আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন নি, একদিনে গাছ তৈরি করা যায়। তবে বীজ থেকে গাছ হতে কেন অনেক সময় লাগে, সেটা জেনেছি। তারপর অনেক বছর বাসে, মিস্টার ফক্স বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, একদিন আমার ভেঁকে আসল কথটা কীল করে দিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, দ্যাখ, এখন তো আর কেউ আমাকে ম্যাজিক দেখাতে ডাকে না, তাই তোকে বলতে আর বাধা নেই। আসলে তিনটে

টবের ব্যাপার। একটা খালি টব, একটাতে লেবুগাছ লাগানো টব, আর একটাতে লেবুগাছে, লেবু ফলে আছে। আমার একজন সহকারী সেই টবগুলো বদলে বদলে দেয়। সেটেকের একটা জায়গা কাটা রাখতে হয়, সেটেকের নিচে সহকারিটি লুকিয়ে বসে থাকে। আমি কালো কাপড় ঢাকা নিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেই সে টব বদলে দেয়। বিলুদা হাসি মুখে বললো, আমি আগেই ধরেছি। তখনই বলেছি, একদিনের মধ্যে, এমনকি দু'দিন দিনের মধ্যেও ধান থেকে গাছ বেরনো কিছুতেই সম্ভব নয়। কখনো কেউ বেধেনি।

বিশ্বমামা এবার চোখ বুঁজে বললেন, সম্ভব।

বিলুদা বললো, আঁ।

বিশ্বমামা বললেন, মিস্টার ফক্সের এ ম্যাজিক আমি ভুলতে পারি নি বলে ঐ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। এখন আমি নিজেই একদিনে বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিতে পারি।

বিলুদা অবিশ্বাসের সুরে বললো, যাঃ! কী বলছেন তুমি!

আমি বললুম, বুঝেছি, আজ তুমি এক বাটি জলের মধ্যে কতকগুলো ছোলা ভিজিয়ে রাখো। কালই সেই ছোলার মুখ থেকে কল বেরবে। সেও তো বীজ থেকে গাছ হওয়া।

বিলুদা বললো, ওটা তো ঝাঁকিবুঝি। ছোলার কল আবার গাছ নাকি?

বিশ্বমামা হাসতে হাসতে বললেন, নীলুটা প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঠিক আছে, ছোলা নয়, অন্য ফলের বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিলে হবে তো? লেবু গাছ, কিংবা আম গাছ?

বিলুদা বললো, আম গাছ তৈরি করে দেখাতে পারো তো বুঝবো, তুমি সত্যিই তুমি ম্যাজিক জানো।

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। আমার দু'দিন সময় লাগবে। ততক্ষণে মাটি তৈরি করবো। এর মধ্যে বাজার থেকে একটা বেশ পাকা সেখে আম জোগাড় কর। আমটা ফেন খুঁতো না হয়, একেবারে বেঁটা থেকে ছেঁড়া।

দু'দিন বাদে সত্যিই ব্যাপারটা শুরু হলো। বিশ্বমামাদেরই বাড়ির পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। তার এক কোনে বানিকটা মাটি কাপা কাপা করা। তার

ওপরে একটা কচের ঢাকনা দেওয়া। সেটা তুলে, পাকা আমটার খোসা খানিকটা ছাড়িয়ে সাবধানে পুতে দেওয়া হলো মাটিতে।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, এবার শুরু হবে, শুভ-নিমন্ত্রণের লড়াই! সেখা যাক, কে জেতে!

বিলুনা বললো, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, সেটা কাল বুঝিয়ে দেবো।

আমি বললুম, কিন্তু বিশ্বমামা, তুমি যে চুপি চুপি করে এখানে এসে একটা চারা গাছ পুতে দিয়ে যাবে না, সেটা কী করে বুঝবে?

বিশ্বমামা বললেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার দুটো উপায় আছে। তোরা এখানেই সারমিন, সারারাত বসে থাক, বসে বসে পাহারা দে। কিংবা, আমার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বক্ষণ থেকে যা। আমার ওপরেই নজর রাখ।

আমরা বিতীর্থটাই বেছে নিলুম।

দুপুরবেলা আমরা বিশ্বমামাকে নিয়ে গেলুম একটা সিনেমা দেখতে। সন্ধ্যার পর টীনে হোটেলে খাওয়া হলো। সব বিশ্বমামারই পরসর অবশ্য। আমরা পরসে কোথায় পাবো?

খাওয়া দাওয়া সেরে পসার ঘরে বেড়ালুম খানিকক্ষণ। বিশ্বমামা টেবিলে গান ধরলো। বিশ্বমামার গলায় একেবারে সুর নেই, বচ্চ বচ্চ গান গায়। কিন্তু সে গান শুনেও আহা আহা করতে হলো। সিনেমা দেখিয়েছে, খাইয়েছে, এরপর কি আর গান খারাপ বলি যার।

বাড়ি ফিরে খানিকক্ষণ গল্প হলো, তারপর ঘুম।

ভোর হতে না হতেই বিশ্বমামাকে ঠেলা নিয়ে জড়িয়ে নিলুম।

বিশ্বমামা চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন, আঃ কীটা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি তো? সূর্যের আলো ফুটেছে? ভালো করে রোন না উঠলে কিছুই হবে না।

আমরা জানলার ধারে বসে রইলুম রোদ্দুরের প্রতীক্ষায়। বিশ্বমামা আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অটোটা বাজার পর নিজেই উঠে পরে বললেন, চল, এজার সেবা যাক।

আমরা প্রায় সৌড়েই গেলুম বাগানে। তাজব ব্যাগার। সত্যিই যেখানে



আমরা পৌত্তা হয়েছিল, সেখানে দুটি পাতা সমেত একটা আমের চারা ঝুঁড়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো।

বিশ্বমামা মুচকি মুচকি হেসে মাথা সোলাতে সোলাতে বললেন, সেখনি, সেখনি আমার ম্যাজিক। এখানে কোনো স্টেজ নেই। আমার কোনো সহকারি নেই, খালি হাতের ম্যাজিক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এরপর তুমি একদিনের মধ্যে এই পাছে আম ফসলাতে পারো?

বিশ্বমামা বললেন, ভাত্তো পারিই। সেটা করা এর চেয়ে সোজা। কিন্তু সেটা আমি করবো না। এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

কিন্তু এবার বললো, বিশ্বমামা, সত্যি তুমি তাক লাগিয়ে দিলে। এটা ম্যাজিক, না আমাদের চোখের ভুল। না বাস্তব।

বিশ্বমামা বললেন, ম্যাজিক, তবে বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

কিন্তু বললো, তা হলে আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও। তুমি তো আর মিস্টার ফল নও।

বিশ্বমামা বললেন, মাটিতে কোনো বীজ পড়লে, সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা দু'চার দিনের মধ্যে তার থেকে গাছ বেগোয় না। কেন? তা জানিস? বীজেরা ঘুমোয়। কেন ঘুমোয়? কেন মাটিতে পড়লো, সেখানকার আবহাওয়া কেমন, এমনও হতে পারে নিজে হবে, তাই বীজ করেকদিন ঘুমিয়ে নেয়। সব বীজ কিন্তু ঘুমোয় না। নীলু যে কাল ছেলার কল বেরবার কথা বলেছিল, তার মানে ছেলা, মটর এরা ঘুমোয় না। অবিকাশে বীজই কিন্তু মাটির মধ্যে করেকদিন ঘুমিয়ে থাকে। আমি বললুম, তুমি সেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বমামা বললেন, আমি নিজে ঠিক ভাঙাই নি। ঐ যে কাজ বললুম শুভ নিশ্চয়ের দৃষ্ট! প্রত্যেক বীজের মধ্যে ডরমিন বলে একটা জিনিস থাকে। এই ডরমিনের জন্যই বীজকে ঘুমোতে হয়। এদিকে বীজ মাটিতে থাকতে থাকতে আর একটা জিনিস তৈরি হয়, তার নাম অকসিন। এই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলে, তার ফলেই বীজের ঘুম ভাঙে। অকসিন বেশি তৈরি হলেই বীজ থেকে গাছ বেগতে শুরু করে। আমি এখানকার মাটি এমনভাবে তৈরি করেছি, যাতে প্রচুর অকসিন খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। সেই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলেছে, আর অমনি গাছ বেরিয়েছে।

বিলুদা বললো, উইরেকা। দারুন ব্যাপার। বিশ্বমামা, তুমি আর কাউকে বলবে না। এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাবো।

বিশ্বমামা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার। উই ইটস এত উদ্ভেলিত হয়ে পড়লি কেন?

বিলুদা বললো, বাঃ হবো না? এরপর আমরা একটা বাগান কিনবো। সেখানে রোজ রোজ আম-জাম-পেয়ারা ফলাবো। প্রতিদিন গাছ হবে, প্রতিদিন ফল পাবো। রাশি রাশি ফল। সেইগুলো বিক্রি করলে বড়লোক হতে কদিন লাগবে?

বিশ্বমামা বললেন, একে বলে গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল। এ জিনিস আমি শুধু একবারই করলাম, তোদের দেখাবার জন্য। আর কোনদিন করবো না। প্রকৃতির একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাকে আমি ভাঙতে যাবো কেন? কারোকে বড়লোক করার জন্য আমি বিজ্ঞানচর্চা করি না।

বিলুনা বললো, তুমি নিজেও তো বড়লোক হবে। এত কষ্ট করে তুমি এই ব্যাপারটা অব্যবহার করলে, এখন তার ফল ভোগ করবে না?

বিশ্বমামা বললেন, তুই 'পীতা' পড়েছিল?

বিলুনা বললো, পীতা? সে তো খুব খটোমটো বই, পড়তে গেলে নীত ভেঙে যায়!

বিশ্বমামা বললেন, কখনো কষ্ট করে পড়ে সেবিস, তা হলে তখন বুঝবি, কেন আমি ফল ভোগ করতে চাই না।

তারপর বিশ্বমামা হাঁটু গেড়ে বসে সেই কটি আমপাতায় খুব যত্ন করে হাত বুলাত বুলাতে বললেন, এবার তোমরা নিজে নিজে বড় হও। আমি আর তোমাদের বিরক্ত করবো না। তোমাদের মায়ের কাঁচা ঘুম জাঙ্কিয়েছি বলে লক্ষ্মীসেনা আমার ওপর রাগ করো না।

বিশ্বমামা এমনভাবে বলতে লাগলেন, যেন চারপাছটা গঁর সব কথা বুঝতে পারছে। বুঝে মাথা নাড়ছে একটু একটু।

কলকাতার বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান (১৯৩১)-এ একটি 'ম্যাথিমিটিক্যাল বিশ্বমামা' নামে চরিত্রিত হয়েছে।





## বিশ্বমামার ম্যাভিক

বিশ্বমামা বললেন, আরতো—রে নীলু আর ঝিলু। তোদের একটা ম্যাভিক দেখাই। কাছে আর, কাছে আর। হাত বাড়িয়ে লে।

আমাদের বিশ্বমামা সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। কখন যে কোথায় থাকেন, তার ঠিক নেই। কখনো হুলুহুলু, কখনো ম্যাফাগাথার। ওঁর নামের সঙ্গে স্বভাবটা বেশ মিলে গেছে। বিশ্বমামা নিজেই বলেন, জানিস, ছোট কেলার আমি যখন খুব দুটুনি করতাম, তখন বাবা আমাকে বকুনি দিয়ে বলতেন, ছেলে একেবারে বিশ্বব্যাটে হয়েছো! দ্যাখ, আমি সত্তা সত্তা তাই হয়েছি।

এবারে তিনি গিয়েছিলেন হিমালয়ের কেন এক দুর্গম অঞ্চলে।

তাতে আমরা বেশ নিরাশই হয়েছিলাম। কারণ বিদেশে গেলে বিশ্বমামা আমাদের জন্য অনেক রকম চকলেট আর টফি আনেন। প্রত্যেকবার নতুন নতুন ধরনের। সেই জন্য উনি গিরলেই আমরা ওঁর চারপাশে লোভে লোভে ঘুরি। যা ব্যর্থ করে গিয়েছেন, কিছুতেই বিশ্বমামার কাছে থেকে কিছু পাওয়া চলবে না, কারণ তা হলে সবই হ্যাংলা বলবে। আর বিশ্বমামাও এমন, ফেরার পরই যে আমাদের চকলেটগুলো ভাঙ করে দেখেন, তা নয়। নিজের কাছে রেখে দেখেন আর এমন সত্য দেখানেন, ফেন কিছুই আনেন নি। তারপর দু'দিন তিন দিন পর হঠাৎ সেগুলো ব্যর্থ করলেন।

এবারে যে চকলেট আনেন নি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হিমালয়ে তো আর চকলেট পাওয়া যায় না।

বিদেশের ফলে হিমালয়ে কেন গিয়েছিলেন, তা-ও বলা মুশকিল। বিশ্বমামা যে সরাসরি কোনো প্রণের দেন না।

বিলুনা ভিজ্জেল করেছিল, উনি উত্তর গিয়েছিলেন, ঘাস রং করতে!

এমন অস্বস্তি কথা কেউ শুনেছে? ঘাস রং করা মানে কী? ঘাসে আবার কেন লোভে রং লাগাতে বাবে?

স্বই হোক, বিশ্বমামার ম্যাজিক দেখার জন্য আমি আর বিলুনা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা একটা হাতে মুঠো করে কী বেন ধরে আছেন। সেটা দেখাবার আগে তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইঁয়ারে, নীলু হোর ছোট কাবর কিডনিতে পাথর হয়েছিল। অপারেশন করে সত্যি একটা পাথর পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ইঁয়, আমি দেখেছি! মাবারি সাইজের একটা গুলির মতন।

বিশ্বমামা বললেন, সেই পাথরটার গন্ধ শুকে দেখেছিল?

আমি বললাম, না তো, গন্ধ শুঁকবো কেন?

বিশ্বমামা এবার বিলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলু, ঝুঁচো দেখেছিল? ঝুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে বল তো!

বিলুনা বললো, তা আমি কী করে জানবো?

বিশ্বমামা বললেন, জানিস না। ও, তা হলে আর কী করে হবে।

বিলুনা বললো, ঝুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে তা জানি না বলে তুমি আমাদের ম্যাজিক দেখাবে না?

বিশ্বমামা বললেন, ইঁয়, দেখাবো ম্যাজিক। যদি ধরতে পারিস, তা হলে আজ সন্ধ্যেকেলা চাইনিজ পাওয়াতে নিয়ে যাবো। আর যদি না পারিস, তা হলে পাঁচটা করে অঙ্ক কবতে হবে।

বিশ্বমামা বসে আছেন একটা টেবিলের একধারের চেয়ারে। আমরা টেবিলের অন্যধারে।

তিনি বললেন, একে একে আয়। আগে, কে?

বিলুনা সব ব্যাপারেই আমার ওপর সর্দারি করে। ও তো আগে যাবেই। মুখে কিছু না বলেই আমাকে ঠেলে এগিয়ে গেল।

বিশ্বমামার যে হাতটা মুঠো করা সেটা লুকোলেন টেবিলের তলার। অন্য হাতটা দিয়ে বিলুবার কী হাত আর ডান হাত একবার করে টিপে টিপে দেখলেন।

ভারপর বললেন, ডান হাতটাই ঠিক আছে।

বিলুনার ডান হাতটা টেবিলের তলায় নিয়ে কী যেন করলেন। ভারপর বললেন, ঠিক আছে। এবার তোমার ডান হাতের তালুর গন্ধ শুঁকে দ্যাখ তো বিলু!

বিলুনা হাতখানানাকের কাছে নিয়ে এলো। তার মুখখানা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গেল। একটা গন্ধ সে পাচ্ছে বটে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

বিশ্বমামা বললেন, একটা গন্ধ পাচ্ছিস?

বিলুনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ।

বিশ্বমামা বললেন, হোম হয়ে গেল। এবার নীলু দুই আয় কাছে।

আমি পাশে দাঁড়িয়েই বিশ্বমামা আমারও দু'হাত টিপে দেখলেন। তার পর বাঁ হাত নিয়ে গেলেন টেবিলের তলায়। কী যেন একটা শক্ত মতন জিনিস ঘষে নিলেন আমার হাতের তালুতে।

আমি হাতটা নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকলাম। আমারও অমনো লাগালো গন্ধটা। কিন্তু বেশ তীব্র গন্ধ।

বিশ্বমামা বললেন, বাস হয়ে গেছে। কী ব্যাপারটা হলো বুঝলি?

বিলুনা আপত্তি জানিয়ে বলেন, এ আবার কী ম্যাজিক? তুমি আমার ডান



হাতে কিছু একটা ঘষে দিলে। তাতে গন্ধ মাখানো ছিল, তাই আমার হাতে গন্ধ হয়েছে। এতে বোঝার কী আছে?

বিশ্বমামা বললেন, ওঃ ছো, আসল কথাটাই বলিনি বুঝি। বিলু, তোর ডান হাতে জিনিসটা ঘষেছি তো? ডান হাতে গন্ধ হতেই পারে। এবার বাঁ হাতটা ঠেকে দেখ। বাঁ হাতে তো কিছু ঘষিনি?

বিলুদা নিজের বাঁ হাত ঠুকলো। আমিও আমার ডান হাতটা ঠুকলাম। সত্যি তো, 'অন্ধ হাতেও গন্ধ এসে গেছে। এ তো সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।

বিশ্বমামা নিজের বাঁ হাত তুলে দেখালেন। সে হাতে কিছু নেই। ডান হাতটা মুঠো করা অবস্থায় ঠেঁটু করলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, তোদের একটি হাত ঘষে দিলাম। সেই হাতের গন্ধ এত তাকাতাড়ি শরীরের মধ্যে দিয়ে অন্য হাতে চলে এলো কী করে? এই হলো ম্যাজিক। যা, চিন্তা করে নিয়ে। বিকেলের মধ্যে বলতে না পারলে কিন্তু চাইনিজ খাওয়ারতে নিতে যাবো না।

আমরা দু'জন সারা দুপুর ভাবলাম। মাথা-মুণ্ড কিছুই বোঝা গেল না। বিলুদা আমার ছোট্টদের একটা সেটের শিশি লুকিয়ে নিয়ে এসে তার খোঁকে খনিকটা এক কানে মেখে বললেন, নীলু, আমার অন্য কানটা ঠেকে দ্যাখ তোর গন্ধ এসেছে কি না।

আমি ঠেকে দেখলাম, না। গন্ধ টুক কিছু নেই। এক দিকের গন্ধ কি কখনো অন্য দিকে যেতে পারে? বিশ্বমামার হাতে তা হলে কী অত্যাশ্চর্য জিনিসটা ছিল?

ডান বিচ্ছে-পোস্ত আর ইলিশমাছ দিয়ে অনেকখানি ভাত খেয়ে বিশ্বমামা এখন লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে প্রচণ্ড। বিশ্বমামার মতন এত বড় নাক আমি আর কোনো মানুষের দেখিনি। ঊঁর গায়ের রং ফরসা বলে আমরা ঊঁর আর একটা নাম দিয়েছি নাকেশ্বর বংশধরে। অত বড় নাক, বেশি জোরে তো ডাকবেই।

বিলুদা বললো, কী রে, নীলু, তুই ম্যাজিকটা বুঝতে পারলি না?

আমি বললাম, তুমি পেরেছো?

বিলুদা বললেন, এসব ম্যাজিক-ম্যাজিক ধরে ফেলা তো ছোট্টদেরই কাজ।

মাথা ঘামাস না কেন? চাইনিজ বাবি কী করে?

—তুমিও খেতে পারছ না।

—এক কাজ করবি নীলু? আমি দেখেছি বিশ্বমামা হাতের সেই জিনিসটা বালিশের নিচে রেখেছে। উপ করে একটু করে বার করে নিয়ে দ্যাখ না।

—যদি জেগে ওঠে? খুব রেগে যায়?

—এত নাক ভাঙছে, এখন ঘুম ভাঙবেই না।

—তাহলে তুমি বার করে আনবে।

—এসব ছোটদের কাজ। আমি পাহারা দিচ্ছি। ঘুম ভাঙলেই শুকে অন্য কথা বলে, ভোলাবো। তুই জিনিসটা নিয়ে আয়।

আমি খুব আর্তে আর্তে গিয়ে বালিশের তলার হাত চোকলাম একটা শক্ত মতন কিছু টেকলো। বার করে এনে দেখি, সেটা একটা মূর্গির ডিমের মতন জিনিস। ওপরে লোম রয়েছে। কিন্তু এমনই শক্ত যে মনে হয় একটা গোল পাথরকে লোমওয়ালা চামড়া দিয়ে মুড়ে রাখা।

বিলুদা ফিসফিস করে বললেন, কঙ্গরি! কঙ্গরি! হরিণের পেটে থাকে।

কঙ্গরির কথা আমিও শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়েছি:

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কঙ্গরি মৃগ সম।'

কিন্তু কঙ্গরি বলে যে মতিই কিছু আছে তাও জানতাম না, কোনোরকম চেষ্টাও দেখিনি।

বিলুদা বললেন, রেখে সে খটাকে, আবার জায়গায় রেখে সে। তা হলে আঙ্গ চাইনিজ খাওয়া হচ্ছেই।

এই সময় বিশ্বমামা জেগে উঠে বসলেন। বিলুদা বললেন, কঙ্গরি! বুকে গেছি।

বিশ্বমামা বললেন, কঙ্গরি? বটে! কঙ্গরি কাকে বলে জানিস?

বিলুদা বললেন, ইঁদা জানি। এক ধরনের হরিণের পেটে হয়।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ! কঙ্গরি জিনিস দেখছি। হিমালয়ের এক ধরনের হরিণ বাসের বলে মাছ ডিম্বার, তাদের পেটে হয়। জানিস নীলু, তুই যেটা ধরে

অহিন্স, সেটাকে বলতে পারিস, আমাদের দেশের সেরা কল্পরি। আর হিমালয়ের হরিণদের পেটে কল্পরি পাখর জন্মাচ্ছে না। আমি এবার সে ব্যবস্থা করে এসেছি।  
বিলুদা বললো, সে কি। তুমি এটা করলে কেন? কল্পরি তো খুব দামী জিনিস।

বিশ্বমামা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, দামী জিনিস। তাই লোকে এই বেচারী সুন্দর হরিণগুলোকে মেরে মেরে শেষ করেছে, তারপর পেট কেটে কল্পরি বাত করবে। কেন, ওরা কী পোষ করেছে? মানুষের কিডনিতে যেমন পাখর হয়, ঐ হরিণদেরও নাতি কোষে পাখর জন্মায় আপনা আপনি। সেই জন্য মানুষ ওদের মারবে? ববারের কাগজে পড়েছিলাম। হিমালয়ে লোকে প্রচুর ঐ হরিণ মারছে কল্পরির লোভে। তা পড়েই আমার গা ছলে গেলো। মনে মনে কদলাম, সেখাচ্ছি মজা! আমি এমন একাটি কেমিক্যাল আবিষ্কার করলাম, যাতে ঐ পাখর গলে যায়। সেই পাখর নিয়ে চলে গেলাম হিমালয়ে।

বিলুদা বললেন, তুমি তোমার সেই শুধু হরিণ ধরে ধরে ইঞ্জেকশন দিলে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, তা তো আর সম্ভব নয়। গোপনে ঘুরে ঘুরে সেখলাম, ঐ হরিণগুলো ঠিক কোম জায়গায় থাকে আর কী ধরনের ঘাস খায়। সেই ঘাসের ওপর আমার শুধু ছড়িতে দিয়েছি বেশ করে। সেই ঘাস খেয়ে কয়েক দিনের মধ্যে ওদের পেটের সব পাখর গলে গেছে। শুধু তাই নয়, এর পর যে বাচ্চা জন্মাবে, তাদেরও কল্পরি হবে না। শিকারীরা এর পরেও দু'তিনটে হরিণ মেরেছিল, পেটে কিছু পায় নি। ঐ হরিণ মারা এমনভাবেই নিষেধ। এখন সবাই বুঝে যাচ্ছে, কল্পরির জন্য শুধু শুধু অত সুন্দর হরিণ মেরেও আর কোনো লাভ হবে না।

আমি বললাম, তা হলে আর কল্পরির গন্ধ কেউ পাবে না?

বিশ্বমামা বললো, কেন পাবে না? সিন্ড্রেট নামে এক ধরনের বেড়াল আর মাক্স র্যাট নামে এক ধরনের ইঁদুরের পেটেও ঠিক এই রকম গন্ধওয়ালা পাখর হয়। সত্যি কথা বলছি, ইঁদুর মারলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তা ছাড়া এখন



কস্তুরির গন্ধওয়ালা কেমিক্যাল তৈরি হয়, তার নাম লিভেটোন। কিছু কিছু গুয়ামও তৈরি হয় এটা দিয়ে।

বিলুনা জিজ্ঞেস করলো, তা হলে আজ আমরা কোথায় চাইনিজ খেতে যাবি?

বিশ্বামা বললেন, আগে আমার ময়জিকটার কী হলো সেটা বল। এখনে তো পারিস নি।

বিলুনা বললো, এ তো খুব সোজা! কস্তুরির খুব তীব্র গন্ধ তুমি এক হাতে মাঝিরে দিলে, তাই অন্য হাতে গন্ধ পাওয়া গেল।

বিশ্বামা হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, মেটেই না। হলো না। একী দুই বীজ পুঁতলি হাওড়ার আর গাছ গজালো কলকাতায়! কস্তুরি কেন, পৃথিবীর কোনো গন্ধই এক হাতে লাগালে তারপর সারা দেহ ঘুরে সেটা অন্য হাতে পৌঁছোতে পারে না।

আমি আর বিলুনা পরস্পরের দিকে তাকলাম।—তা হলে?

বিশ্বামা বললেন, বুঝতে পারিস না তো? আমার ডান হাতে ছিল কী, ঐ কস্তুরিটা? আর অন্য হাতে? কিছুই না। আমায় যদি কেউ এই ময়জিকটা

সেখাতো, তা হলে আমি সেই ম্যাজিশিয়ানের বা হাতের গন্ধ গুঁকে দেখতাম।

বিলুনা বললো, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, এই যে কঙ্করটা দেখছিল, এটাতে আসলে বেশি গন্ধই নেই। এর লাল চামড়া তুলে ফেলে জিনিসটা তুলে ফেলা হয়। তখনই ভালো গন্ধ বেরোয়। ঐ জন্য হরিণেরা বর্ষন ভ্রম করে, কিংবা বৃত্তিতে ভেজে, তখনই নিজের গায়ের গন্ধটা ঠিক ঠিক পায়। বানিকটা কনসেন্ট্রেট কঙ্করির নির্বাসি আমি আমার বা হাতে লাগিয়ে রেখেছিলাম। ঐ হাত দিয়ে বা ধরবো তাতেই গন্ধ হবে। ঐ হাত দিয়ে আমি তোদের অন্য হাত দুটো ধরেছিলাম, মনে নেই!

বিলুনা বললেন, তুমি আমাদের ঠকিয়েছো?

বিশ্বমামা বললেন, ঠকিয়েছি কী যে, ঠিকই তো ম্যাজিক। তা হলে চাইনিজ খাওয়া হলো না। পাঁচখানা করে অন্ন কবতে হবে। অন্ন-গুলো যদি রাইট হয়, তখন না হয় চাইনিজ খাওয়ার কথা আবার ভেবে দেখা যাবে।





## বিশ্বামামার গোয়েন্দাগিরি

**স**কাল বেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিশ্বামা একটা বিরাট হংকার দিয়ে বললেন। ঠাঁ! আবার বুজলকি!

আমি আর বিলুনা ঘরের মোকোতে বসে সাপলুছো খেলছিলাম। আমার খুঁটিটা একবারে অটিনবুইয়ের বরে এসে একটা বিরাট সাপের মুখে পড়ে গেল।

বিলুনা মুখ তিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে বিশ্বামা? বিশ্বামা লম্বা নাকের ভগ্নায় একটা আঙ্গুল ছুঁইয়ে বললেন, আমাদের এখানে বৃষ্টির নাম পক্ষ নেই। বাড়ুগ্রামে এক সন্ন্যাসী নাকি যজ্ঞ করে মন্ত্র পড়ে পর পর দু'দিন বৃষ্টি নামিয়েছে। ছিটেফোটা নয়, দারুণ বৃষ্টি।

বিলুনা কাগজটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো। বাড়ুগ্রামের কাছে বিনপুর নামে একটা আরপার এক আত্মিক সন্ন্যাসী মেঘ দমন যজ্ঞ করেছে। যজ্ঞ শুরু করার আগেই সে সবাইকে বলে দিয়েছিল যে এক ঘটার মধ্যে সে বৃষ্টি নামিয়ে দেবে। অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। সত্যি সত্যি হঠাৎ কুশ কুশ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সবাইকে ভিজিয়ে দিল। এ রকম দু'দিন ঘটেছে।

বিলুনা বললেন নিজস্ব সংবাদদাতা এ খবর পাঠিয়েছে। তা হলে কি এটা মিথ্যে হতে পারে?

বিশ্বামা হেসে বললেন, খবরের কাগজের সব খবর বুকি সত্যি হয়? 'খবর' কখনো কী ভাবে তৈরি হয়েছে জানিস? খারাপের খ, বদ লোকের ব, আর রং চড়ানোর র। সেববি সব খারাপ খবর। কোথায় ট্রেন অ্যান্ড্রিভেটে বহু লোক মারা গেছে, কোথায় ভাঙতি হয়েছে, কোথায় দলদলিতে সরকার ভেঙে যাচ্ছে। এই সবই বড় বড় করে লেখা হয়। ভালো খবর কিছু থাকে? ভালো লোকদের চেয়ে বদ লোকেরাই বেশি পাক্সা পায়। যে যত বেশি টাকা চুরি করে, তার নাম তত বড় বড় আঁকরে ছাপা হয়। আর রং চড়ানো, কোথায় সামান্য

কিছু একটা ঘটলেও খবরের কাগজের লোকেরা অনেক রং চড়িয়ে, বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেবে।

বিলুনা বললো কিন্তু বিশ্বমামা, তোমার সম্পর্কেও তো মাঝে মাঝে খবরের কাগজে লেখা হয়। তোমরা আবিষ্কারের খবর। সেটা তো খারাপ খবর না, তুমি বল লোক নও, রংও চড়ায় না! তা হলে?

বিশ্বমামা বললেন, তা কি প্রথম পাতায় ছাপে? ভেতরের দিকে ছোট ছোট অক্ষরে, যাতে লোকের চোখে না পড়ে। তা-ও সাংবাদিকদের বা অভ্যাস একটা অর্থাৎ রং না চড়িয়ে পারে না। একবার একটা কাগজে লিখে নিল, আমি নাকি শাড়ে ছ'ফুট লম্বা। আমি মোটে ছ'ফুট এক ইঞ্চি, কতখানি বাড়িয়ে নিল সেখানি?

আর লুফো খেলা হবে না বুঝতে পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, বিশ্বমামা মানুষ ইচ্ছে করলে বুদ্ধি বৃষ্টি নামাতে পারে না? তবে যে শুনেছিলুম, আলমবরের সভায় যে মস্তবড় গায়ক ছিলেন তানসেন, তিনি নাকি মেঘমাত্রার গান গেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছিলেন?

বিশ্বমামা বললেন, মানুষ বৃষ্টি নামাতে পারবে না কেন? আমিও পারি। তবে গান গেয়ে কিংবা মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানো যায় না। কারণ মেঘের কান নেই। মেঘ শুনে কী করে? তানসেন আসলে এক ভালো গান গেয়েছিলেন তা শুনে অনেক লোক কঁদে ফেলেছিল। সেই চোখের জলের বৃষ্টি নেমে ছিল।

বিলুনা বললো, তুমি বৃষ্টি নামাতে পারো?

বিশ্বমামা অবহেলার সঙ্গে বললো পারবো না কেন? এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

আমি বিশ্বমামার কাছে লগ্নে বললুম, একটু দেখাও না। এইখানে একবার বৃষ্টি নামিয়ে দেখাও। কতদিন বৃষ্টি হয় নি।

বিশ্বমামা বললেন, জানলা দিয়ে দেখ তো, আকাশে মেঘ আছে কি না। আমরা দুই ভাই ছুটে গেলুম জানলার কাছে। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই, আকাশ একেবারে খটখটে।

বিশ্বমামা ভুরু নাচিয়ে বলেন, তা হলে তো হবে না! মেঘ থাকলে আগে

আপে বৃষ্টি নামানো যায় যদিও তাতে অনেক ব্যবস্থা লাগে কিন্তু মেঘ না থাকলে বৃষ্টি নামানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ একেবারে মেঘ তৈরি করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করে নি।

বিলুদা বললেন, এখানে না থাকলেও বাড়িগ্রামে হয়তো মেঘ করেছে। তাই সাধুটি বৃষ্টি নামাতে পেরেছেন।

বিশ্বমামা বললেন, বাড়িগ্রামে মেঘ হতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু তাতে সাধুটির কোনো কেরামতি থাকতে পারে না। বাংলার একটি প্রবাদ আছে জানিস তো, 'কতড় কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে'। তার মানে জানিস? একটা তালগাছের তলায় একটা কাক বসে ছিল, একজন ফকির তার শিষ্যদের বললেন, আমি মৃত্যু পড়ে এই কাকটাকে মেরে ফেলতে পারি। ফকির তো মৃত্যু আউড়িয়েই চলেছে, এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠলো, আর তালগাছ থেকে খসে পড়লো একটা পাকা তাল। পড়বি তো পর, সেটা ঠিক পড়লো এই কাকটার ওপর, তাতে কাক বেচারি মারা গেল। ফকির বললেন, সেখালে, সেখালে আমার কেরামতি! আসলে কিন্তু ঝড় না উঠলে তালও তখন পড়তো না, কাকটাও মরতো না। একেই বলে কাকতালীয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ঠিক ঐ সময়েই ঝড় উঠলো কেন?

বিশ্বমামা বললেন, সেদিন হঠাৎ ঝড় উঠেছিল বলেই তো গরুরা ঝড়িয়েছে। ঐ ফকিরকে যদি বলা যায়, আর একবার মৃত্যু পড়ে ঝড় তোলো। সে পারবে পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

বিলুদা বললো, কিন্তু এখানে যে লিখেছে সাধু যন্ত্র করে পরপর দু'বার বৃষ্টি নামিয়েছে?

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁ। তা বটে। হ্যাঁরে, তোসের ছোটকাকার দেশের নাম কী রে?

বিশ্বমামা হঠাৎ অচমক্কা এমন এক একটা কথা বলে, যার কোন কারণই বোঝা যায় না। ঐই সময় হঠাৎ ছোটকাকার দেশের প্রবল আসে কী করে?

বিলুদা বললেন, ছোটকাকার দেশের নাম তো ভলুদা।

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, ভালো নাম কী? ভল্টুদা বললে কেউ চিনবে?

আমি মাথা চুলকোতে লাগলুম। তাই তো ভল্টুদার ভালো নামটা কী ফেল? মনে পড়ল না।

বিলুদা বললেন, প দিয়ে নাম। প্রফুল্ল, প্রশান্ত? না, না, প্রাণপোপাল, না প্রমথেশ, তা-ও না।

বিশ্বমামা বললেন প দিয়ে হাজারটা নাম হয়। তোর মায়ের কাছ থেকে জেনে আয়—

তত্কুনি আমার মনে পড়ে গেল। ভল্টুদার ভালো নাম প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শী মুখার্জী!

বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু এখন কাড়গ্রামের এস. ডি. ও, তাকে ফোন করলেই তো আসল ঘটনা জানা যাবে!

বিশ্বমামা টেলিফোনের কাকে দিয়ে বললেন, একবারেই লাইন পাওয়া গেল। বোন ভল্টুদার সঙ্গেই কথা-বার্তা শুরু হলো। বান্নিকমুখ কথা বলার পর বিশ্বমামা চোঁটেরে উঠলেন, এক গীট্টা মারবো। তোর কানটা মূলে বেবো! তুইও মন্ত-মন্তে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস!

ফোনটা রেখে দিয়ে বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু নিজের চোখে বৃষ্টি পড়তে দেখেছে। চল তো, কাড়গ্রামে গিয়ে আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে আনি! যদি মন্ত পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারে, তাহলে আমার বিজ্ঞান পড়া ব্যর্থ হয়ে যাবে!

আমরা লাফিয়ে উঠলুম। আর কিছু না হোক কাড়গ্রামে বেড়াতে যাওয়া হবে তো। ভারি সুন্দর জায়গা। কাছাকাছি জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে।

বিশ্বমামার পুরোনো গাড়ি, মাঝে মাঝে রাস্তায় খেমে যায়, তখন আমাদের টেনেতে হয়। এবারে সে ততকম কিছু হলো না। মাঝপথে একটা ধাবার খেমে চমৎকার পরম পরম কুটি-মাসে বাওয়া হলো।

আমাদের ভল্টুদা কাড়গ্রামের এস. ডি. ও সাহেব, সবাই তাকে খুব খতির করে। যে-কোনের লোককে জিজ্ঞেস করলে তার বাংলায় দেখিয়ে দেয়। বিলুদা

আমার বললেন, সাবধান নীলু, এখানে লোকজনের সামনে ভল্টুনা বলে ডাকবি না। বলবি প্রিয়না, কিংবা ছোটুলা।

সে বাংলোয় গৌছে বিলুনা নিজেই আগে ভল্টুনা বলে ডেকে বললো। বিশ্বমামা, একগাধা লোকের সামনে বললেন, এই ভল্টু খবর না দিয়েই চলে এলুম তোরা এখানে।

ভল্টুনা অবশ্য আমাদের সাথে খুব খুশি। মস্ত বড় বাংলো, থাকবার জায়গার কোনো অসুবিধে নেই।

সন্ধ্যাবেলা বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে শোনা গেল আসল কাহিনী।

সন্তোষ মিত্র নামে এক ভদ্রলোক জার্মানীতে থাকতেন। বছর চারেক আগে এখান থেকে খানিকটা দূরে বিনপূরে অনেকখানি জমি কিনে বসবাস করছেন। একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়িও বানিয়েছেন, ফলের বাগান আছে, তাতে লাগিয়েছেন অনেক রকম ফলের গাছ। লোকটির ব্যবহার ভালো, বিনপূরের লোকেরা তাকে পছন্দ করে।

গত বছর এখানে ভালো বৃষ্টি হয় নি। এ বছরও এখনো বৃষ্টির দেখা নেই। সেই জন্য সন্তোষ মিত্র একজন সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছেন। এ সাধু অন্য সময়ে থাকেন হিমালয়ে, তাঁর অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যজ্ঞের সময় তিনি মন্ত্র পড়ে সত্তা সত্তা বৃষ্টি নামিয়েছেন। একবার নয়, দু'বার, একবার হলে বলা যেত কাকতালীয়। প্রথমদিন অনেকেই ব্যাপারটা জানতো না। বৃষ্টি নামার পর দলে দলে লোক ছুটে গেল যজ্ঞ দেখার জন্য। দ্বিতীয় দিন সাধু যজ্ঞ বলার আগে সবাইকে বলে দিলেন, কেউ টু শব্দ করবে না। সবাইকে চুপ করে থাকতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বৃষ্টি নামিয়ে দেব।

বিশ্বমামা ভল্টুনাটিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ছিলি সেখানে, তুমি দেখেছিলি? ভল্টুনা বললেন হ্যাঁ দেখেছি। নিজের ডোবেই দেখেছি? অবিশ্বাস করবে কী করে?

বিশ্বমামা বললেন কী দেখলি, ভালো করে বল।

ভল্টুনা বললেন, যজ্ঞের কাছেই আমাকে একটা চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল। দাঁড় দাঁড় করে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। তার দু'দিকে বসে আছে সন্তোষ মিত্র আর সেই সাধু। সাধুটি আগুনে দি ছিটোচ্ছেন আর মন্ত্র পড়ছেন। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ এক ঠোঁটের দু'ফোঁটা করে জল পড়তে লাগলো সেই আগুনে। তারপরই একেবারে বৃষ্টি। আমাদের দৌড়ে যেতে হলো বাড়ির মধ্যে।

বিশ্বমামা প্রবল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, হতে পারে না! এ হতে পারে না। আসলে মেঘ ছিল আগে থেকে।

ভল্টুনা বললেন, তা ছিল।

বাইরে একটা জিপ গাড়ি থামলো এই সময়ে। তার থেকে নেমে এলেন একজন অয়েনো লোক।

ভল্টুনা বললেন, ঐ তো এবানতার পুলিশ সাহেব এসে গেছেন। একে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু বিশ্বমামা, প্রিজ, ঊঁর সামনে আমাকে ভল্টু বলে ডেকে না।

পুলিস সাহেবের নাম দিববিজয় সরকার। আলাপ পরিচয় হলো। তারপর বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, ইঁা মশাই আপনিও সাধুকে বৃষ্টি নামানোর দেখেছেন?

সরকার সাহেব বললেন, ইঁা দেখলুম তো! আরও অন্তত পাঁচশো লোক দেখেছে। এর মধ্যে জাল ছোড়ুরি কিছু নেই। সাধু মন্ত্র পড়লো আর বৃষ্টি নামলো।

বিশ্বমামা আবার জোর দিয়ে বললেন, এ হতে পারে না।

সরকার সাহেব বলেন, আমিও মন্ত্র-টন্ত্র কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সাধুটি সক্তি তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আরও আশ্চর্য কথা কী জানেন, সন্তোষ মিত্রের বাড়ি-বাগান দিয়ে পঁচিশ বিঘে জমি। বৃষ্টি পড়েছে শুধু এ পঁচিশ বিঘের মধ্যে। অন্য সব জায়গা শুকনো খটখটে।

ভল্টুনা বললেন। উনি বরচ-পত্র করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন, তাই শুধু নিজের জমিতেই বৃষ্টি নামিয়েছেন।

বিশ্বমামা পুলিশ সাহেবকে বললেন, আপনার ঐ সাধুকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল।

পুলিশ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সে কী? অ্যারেস্ট করবো কী অপরাধে? নিজের জমিতে বসে কেউ যদি পূজো বা যজ্ঞ করে, সেটা তো সোমের কিছু না।

বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু, ইয়ে খুতি, প্রিয়দর্শী। আমরা একবার কিনপুরে ঐ বাড়িটা গিয়ে দেখতে পারি?

ভল্টুদা বললেন, হ্যাঁ, আমি নিয়ে যেতে পারি। সেই সাধু এখানে রয়েছেন তার সঙ্গেও কথা বলতে পারো। বোধহয় আরও বৃষ্টির জন্য আবার যজ্ঞ করবে।

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। আমার অন্য পরিচয় দিবি না। শুধু বলবি, তোরা আশীর্বাদ। এমনিই বেড়াতে এসেছি।

ভল্টুদা বললেন, ঠিক আছে, আজ তো রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে যাওয়া যাবে।

বিশ্বমামা বললেন, সংশোধ মিত্র জার্মানি ফেরত অঞ্চল সাধুকে নিয়ে যজ্ঞ করায়, সরকার সাহেব বললেন, আজকাল বিদেশে অনেক সাহেব-মেমও এ সঙ্গে বিশ্বাস করে। সত্যি মন্ত্রের জোর আছে বটে।

বিশ্বমামা এরপর কিছুকণ্ড গুম হয়ে বসে রইলেন। অন্য সময় বিশ্বমামা কত মজার গল্প বলেন। এখন আর তাতে মন নেই। ভল্টুদা আর পুলিশ সাহেব, এরা তো মিথো কথা বলবে না। একজন সাধু মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নাখিয়েছে, ওরা নিজের চোখে দেখেছে, তা শুনে বিশ্বমামা কি ঘাবড়ে গেলেন। মন্ত্রের কাছে বিজ্ঞানও হার মানলো?

আমরা অন্য গল্প করতে লাগলুম, বিশ্বমামা চুপ।

পরিষ্কার আকাশ। অনেক তারা ফুটে আছে, বাইরের আকাশে তারগুলোকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। একটা গ্লেন উড়ে গেল, কী সুন্দর দেখালো সেটাকে।

বিশ্বমামা এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, মাঝে মাঝে গ্লেনের শব্দ শুনি। এখন দিয়ে এত গ্লেন যায় কোথায়?

ভল্টুনা বললেন, কাছেই তো কলহিকুণ্ড। সেখানে আমাদের এয়ার ফোর্সের একটা বেস আছে। সেখান থেকে প্লেন ওড়ে, এই শব্দ শোনা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বললেন, আমার বাথলোর পাশেই ট্রেন লাইন। মাঝরাতে ট্রেনের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার এখনো অভ্যাস হয় নি!

এক সময় খাবারের ডাক পড়লো, দারুন ব্যবস্থা করেছেন ভল্টুনা, প্রথমে ভারতের সঙ্গে নূরকম মাছ, তারপর গরম গরম লুটির সঙ্গে মাংস। তিন রকম মিষ্টি।

বিশ্বমামা এত খাদ্যরসিক, আজ কিছুই প্রায় খেলেন না। মিষ্টিওলো খুলেন না পর্যন্ত। বিশ্বমামার এরকম মন আমি কখনো দেখিনি।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমার রঙনা দিলুম বিনপূরের দিকে।

বেশ দূর নয়, বড় রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে সন্তোষ নিজের বাড়ি। চারদিকে শুকনো শুকনো ভাব, এই বাড়ীর বাগানে গাছগুলো বৃষ্টির জল বেয়ে বেশ তরতাজা। ফলের গাছগুলো বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কাছে ফল ধরেছে। কয়েকটা কলা গাছে কলা ফলে আছে।

সন্তোষ মিত্র একজন মাঝবয়সী অমায়িক ভদ্রলোক। ভল্টুনার সঙ্গে এসেছে বলে আমাদেরও বাড়ির করলেন খুব। বাড়ির সামনে মত্ত বড় বারান্দা, তাতে অনেক চেয়ার পাশ।

একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় বাঘের চামড়ায় আসনে বসে আছেন এক লম্বাসী। মাথায় ভটা, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা লড়ি নৌক। তিনি সিগারেট খাচ্ছেন, আর একটা খবরের কাগজ পড়ছেন। কোনো গেলুয়া পরা লম্বাসীকে সিগারেট টানতে আমি আগে দেখিনি। শুনেছিলাম লম্বাসীরা গাঁজা খায়।

বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে সন্তোষ মিত্র জোর করে আমাদের ডব্ল ডিমের ওয়ালেট খাওয়ালেন। বিশ্বমামা নিজেরটা কিছুতেই খেতে চাইলেন না পরে বিনুবা টপ করে প্লেটটা নিজের কাছে নিয়ে নিল।



আমি চুপি চুপি বিলুদাকে বললুম, আমাদের বিশ্বমামাও বৃষ্টি নামাতে পারেন বলেছিলেন। এই সাধুর সঙ্গে বিশ্বমামার একটা কমপিটিশন হলে ভালো হয় না?

বিলুদা বললেন, চুপ। বিশ্বমামা রেগে আছে। এখন কিছু বলতে যাব না। বিশ্বমামা সন্তোষ মিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সাধুজীকে আপনি পেলেন কোথায়?

সন্তোষ মিত্র বললেন, গত বছর আমি হরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আলাপ। কথায় কথায় বলেছিলাম, বাড়িগ্রামের কাছে অনেক টাকা খরচ করে মস্ত বাগান করেছি কিন্তু ফলের অভাবে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। পরপর দু'বছর ভালো বৃষ্টি হয়নি। এদিককার পুকুরও শুকিয়ে যায়, কুরোতে জল থাকে না। তা শুনে সাধুজী বললেন, এ আবার সমস্যা নাকি? আমি ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি নামিয়ে দিতে পারি। তাই শুকে নেমস্তন্ন করে নিয়ে এসেছি।

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি সাহারা মরুভূমিতেও বৃষ্টি নামাতে পারেন?

সন্তোষ মিত্র তাতে খানিকটা অধুশি হয়ে বললেন, জেনে আমার দরকার কী? আমার বাগানে জল পেলোই হলো।

বিশ্বমামা বললেন, তা ঠিক! আপনার বাগানটি চমৎকার হয়েছে। আশে পাশে এমন সুন্দর ফলের বাগান করার নেই।

এরপর বিশ্বমামা উঠে গেলেন সাধুটির কাছে।

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা বললেন, নমস্তার সাধুজী! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা অনেক শুনেছি।

সাধু হাত তুলে আশীর্বাদ জ্ঞালালেন।

বিশ্বমামা আমাদের বললেন, প্রণাম কর, প্রণাম কর, ভালো অভিনেতা। ভালো অভিনেতাও তো একজন শুণী।

সাধু এবার কটমট করে তাকালেন বিশ্বমামার দিকে। কড়া গলায় বললেন

তুমি বুদ্ধি বিশ্বাস করো না? হাজার  
খানেক লোক আমার মনুশক্তি  
দেখেছে। তোমরা আজকালকার  
ছেলে, দু'পাতা ইংরিজি পড়েই  
সবজান্না হয়ে গেছ। ঠাকুর-মাকুর  
মানো না, ধর্ম মানো না। সেই জন্যই  
তো দেশটা উজ্জ্বল হয়েছে। যতলব  
অকালকুস্মান্ত!



গালাগালি খেতেও কিন্তু বিশ্বমামা  
চটলেন না। হাসি মুখে বললেন, রাগ  
করছেন কেন? সকলকেই কিছু না কিছু অস্তিত্ব করতে হয়, আমিও করি। আজ্য  
সামুজী, আপনি আকাশে উড়তে পারেন?

সামু বললেন, কী?

বিশ্বমামা আবার বললেন, আপনার তো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, আপনি  
আকাশে উড়তে পারেন? এখানে বসে মস্ত পড়লে তো মেঘেরা গুনতে পারে  
না। কখন বৃষ্টি নামাতে হবে তা মেঘেরা বুঝবে কি করে?

সামু বললেন, আমরা আকাশে ওড়ার দরকার হয় না। এখানে বসে মস্ত  
পড়লেই কাজ হয়। পরশু সিনই আবার যজ্ঞ করবো, তখন সেবতে পাবে।

বিশ্বমামা বললেন, তা হলে এখানে আরও দু'দিন থেকে যেতে হয় দেখছি।  
সামুজী, আমার সামনে আপনি যদি মস্ত পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারেন, তা হলে আমি  
আমার একটা কান কেটে ফেলবো।

সামু বললেন, তা হলে ধরে নাও, তোমার একটা কান কাটা গেছে! আজ  
আবার মেঘ জন্মেছে। বৃষ্টি আমি নামাবই।

এই সময় বাড়ির মধ্য থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। সাদা প্যান্ট আর  
সাদা শার্ট পরা। হাতে একটা মীল বর্তীর দেওয়া সাদা টুপি।

কথা থামিয়ে বিশ্বমামা কৌতূহলী হয়ে সেই লোকটির দিকে চেয়ে

রইলেন। তারপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি।

সন্তোষ মিত্র বললেন, এ আমার মাসভূতো ভাই সুবোধ!

বিশ্বমামা সুবোধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই বাড়িতে থাকেন?

সুবোধের কলমে সন্তোষ মিত্রই আবার কললেন, না, মাঝে মাঝে আসে।

ও তো এয়ার ফোর্সের অফিসার। কলহিকুণ্ডার ফাইটার প্লেন চালায়।

বিশ্বমামা বললেন, আমারও সেখান থেকেই পাইলট মনে হয়েছিল। সুবোধ বাবু এখন তো যুদ্ধ চলাচ্ছে না, তবু আপনাকে মাঝে মাঝেই আকাশে প্লেন গুড়াতে হয়?

সুবোধ বললো, তা তো হয়ই! ট্রায়াল নিতে হয়। আপনাকে তো চিনলাম না?

উত্তর না নিয়ে বিশ্বমামা-হো-হো হেসে উঠলেন, হাসি তো নয় অট্টহাস্য যাকে বলে!

সন্তোষ, সুবোধ দু'জনেই সেই হাসি শুনে হকচকিয়ে গেল। ভল্টুনাও এগিয়ে এলো কাছে।

বিশ্বমামা হাসি থামিয়ে সুবোধের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, ও লাধু-টাধুর কন্ম নয়। আপনিই বৃষ্টি নামাবার আসল গুস্তান। সলিড কার্বন ডাই অক্সাইড না গিলভার আরোক্তাইড?

সুবোধও এবার মূদু হেসে বললো, আপনি ধরে ফেলেছেন বেশি।

বিশ্বমামা বললেন, আমি প্রথম থেকেই ভাবছি, আকাশে গুড়ার ব্যবস্থা না থাকলে তো বৃষ্টি নামানো সম্ভব নয়। এই তো একজন জলজ্যান্ত পাইলট পাওয়া গেছে!

তারপর আমাসের দিকে তাকিয়ে কললেন, ব্যাপারটা বুঝলি? মেঘ মানে কী। খুব ক্ষুদ্র জলকণা, তাই তো? সেই জলকণাগুলো জমটি বেঁধে বড় বড় কৌটা হয়ে বৃষ্টির মতন করে পড়ে। স্বতঃস্বেচ্ছা বৈশি না হলে বৃষ্টি নামে না। কেউ যদি প্রেমে করে উঠে গিয়ে সলিড কার্বন ডাইঅক্সাইড কিংবা গিলভার

আয়োডাইড মেঘে ছড়িয়ে পড়ে  
পারে, তা হলেই অলকশাওলো মনা  
বেঁধে বৃষ্টি হয়ে করে পড়বে।  
সুবোধবাবু কলহীকুণ্ডা থেকে উঠে  
এসে এবানকার আকাশের মেঘে সেই  
জিনিস ছড়িয়ে দেন।

তন্দুলা তবু আশ্বিনাসের যত্নে  
বললো, তা হলে, তা হলে সাধুর  
দরকার কী? সাধু মন্ত পড়লেন...

বিশ্বমামা বললেন, শুধু শুধু এই  
একটা বাগানের মাঝে মাঝে বৃষ্টি হবে, অন্য কোথাও হবে না, তাতে লোকের  
সন্দেহ হবে। সেই জন্যই একজনকে সাধু সাজিয়ে তত্ত্ব লেখানো দরকার। এবান  
দিয়ে একটা গ্লেন উড়ে গেছে, তা কেউ লক্ষ করে নি। কী সুবোধবাবু, ঠিক  
বলছি?

সুবোধ একলো হাসছে।

বিশ্বমামা বললেন, আপনি হাসছেন কটে। কিন্তু ঐ সাধুর বললে আপনারকেই  
পুলিশের আরেস্ট করা উচিত।

সুবোধ বললো : কেন কেন কী অভিযোগ?

বিশ্বমামা বললেন, চুরি।

সুবোধ বললেন, চুরি? তার মানে? আমি কার কী চুরি করেছি। সিলভার  
আয়োডাইড আমি কিনি নিজের পরসার। আকাশের মেঘ কার সস্পত্তি নয়।

বিশ্বমামা বললেন, অবশ্যই মেঘ কার ব্যক্তিগত সস্পত্তি নয়। এই মেঘ  
থেকে আভাবিক বৃষ্টি হলে আশে পাশে সব্বার জমিতে বৃষ্টি পড়তো। আপনি  
শুধু এই বাগানে বৃষ্টি ফেলে অন্যদের বঞ্চিত করছেন। কর্তা শুক হবার আগেই  
সুভোধবাবুর বাগানে বৃষ্টি পড়ার ফলে তাঁর পাছগুলো বেশি বাড়ছে।

সুভোধবাবু বললেন, আমি জ্ঞানভ্রাম না এটা একটা অপরাধ। আমি  
ভেবেছিলাম, এটা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।



বিশ্বমামা বললেন, ইচ্ছে মতন কেউ কেউ তার জমিতে আলো ভাবে বৃষ্টি ফেলিয়ে নিলে কিছুদিন পর সারা দেশে মারামরি শুরু হবে যাবে। সেই জন্যই এই পরীক্ষা এখন বন্ধ।

সুবোধের বিকে ফিরে বললেন, আপনি এয়ার ফোর্সের পাইলট। এয়ার ফোর্সের ট্রেনে এককম ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করাটাও অপরোধ নয়? জানাম্মানি হলো আপনার চাকরি যাবে। অবশ্য সেটা মানাবার দায়িত্ব আমার নয়।

এখানে বী কথাকর্তা হচ্ছে নাথুর্গী তা উল্লেখ পাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ গভীর ভাবে একটি মস্ত উচ্চারণ করতে লাগলেন।

বিশ্বমামা সেবিকে ডাকিয়ে বললেন, বলেছিলাম না ভালো অভিনেতা। ঐ নাথুর্গী বোধহয় এই সন্তোষবাবুর এক মালকুতো ডাই।

বিলুদা বললো সৌক দাড়িগুলো আসল না নকল টান মেটে দেখবো।

ভলুদা বললে না, না, না, মরকার নেই, মরকার নেই।

